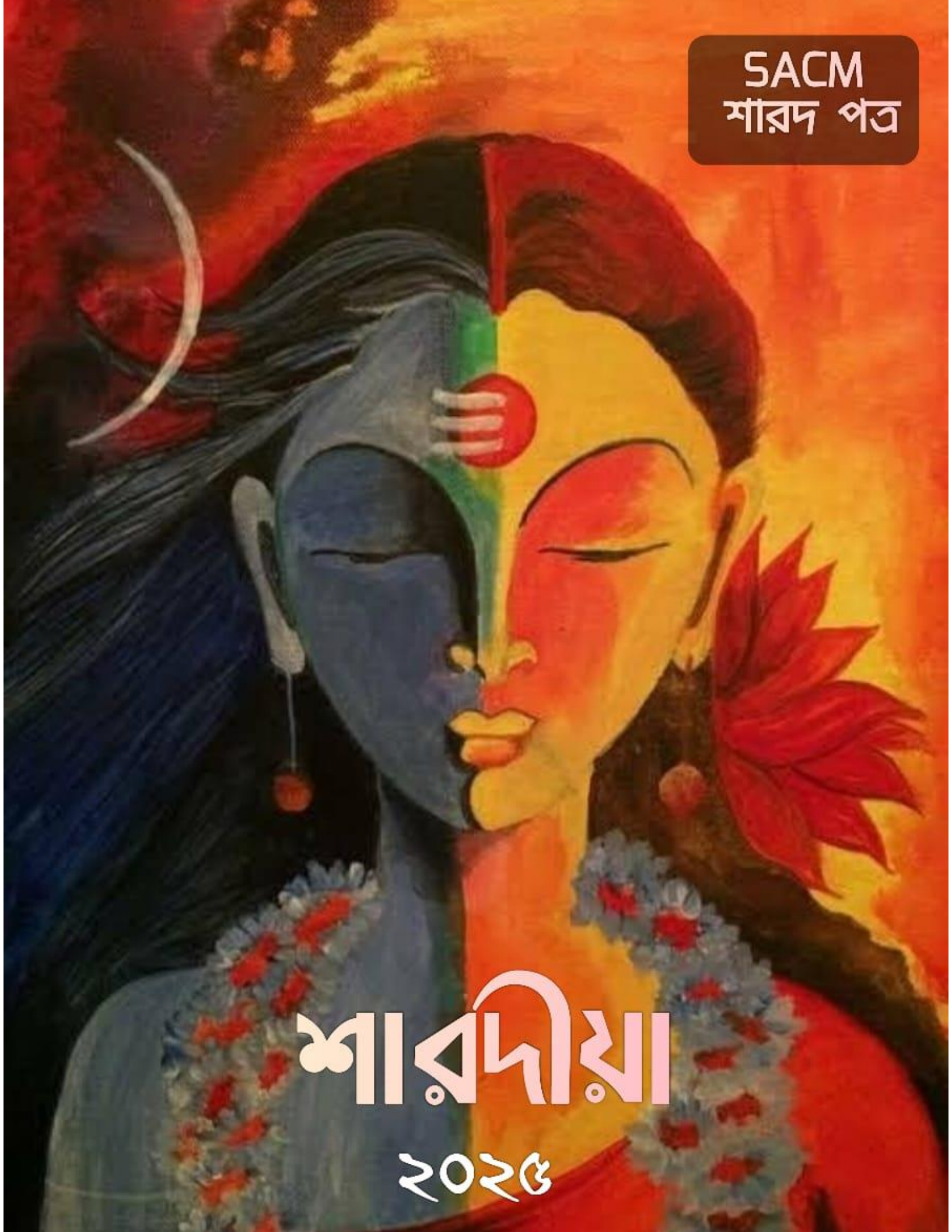
SACM
শারদ পত্র
শারদীয়া
২০২৫

সূচীপত্র

অধ্যক্ষ মহাশয়ের কলমে		
সম্পাদকীয়		
প্রবন্ধ		
বিদ্যামন্দিরের বিবর্তন	অধ্যাপক সুনীপ কুমার মাইতি	1
সাম্প্রতিক নেপালঃ একটি সতর্কবাণী	অধ্যাপক **নিমাই পোদ্দার**	3
মগজধোলাই	অধ্যাপক গোপাল দেব কণ্ঠ	6
কোমাগাতামারু	অধ্যাপক দেবাশীষ বেরা	8
কলকাতার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক মিথ থেকে ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধানে	ড. পার্থপ্রতিম রায়	15
The Bigining of the Indian Novel	Dr. Arundhati Bhadra	20
Yes! I am only 12 year old - A story for all parents	Dr. Richa Chaurasia	22
The Journey from 2025 to 2045: Technology, Humanity & the Choice Ahead	Dr. A. Shanker Prakash	23
Prompt Engineering - An Essential Requirement for the Future	Prof. Raja Pathak	26
The Cruellest April : Kadambari Devi and Rabindranath's First Grief	Dr. Parthapratim Roy	30

কবিতা

দুই দিক	ডঃ শান্তনু সেন, অধ্যক্ষ	36	হব কলির কেষ্ট	কৌশিক দাস	37

ছাত্রছাত্রীদের লেখা

জীবন জীবিকার উৎসব	বিশাখা দাস	38	মূর্তি-ই হয় মা!	জিতু দে	47

ছোটোদের পাতা

Skill Development & Entrepreneurship	Suhani Sen	41
এক পক্ষীর আত্মকথা	সুহানি সেন	42
Love is Love	Kritadhi Das	43
Mahisasuramardini	Sarthak Kunti	43
The Lost City of India : Musiris	Rakshit Chaurasia	46
Yours	Dipanwita Pathak	44
Binary	Pratichi Roy	45

বহুবর্ণ চিত্র

অহনা ঘোষ 2, 14
সুহানি সেন 40
রক্ষিত চৌরাসিয়া 46
অর্চিনি দাস 7
জিতু দে 48

সম্পাদনা ও অলংকরণ – অধ্যাপক ডক্টর পার্থপ্রতিম রায়

শহীদ অনুরূপ চন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের শারদ পত্র ২০২৫

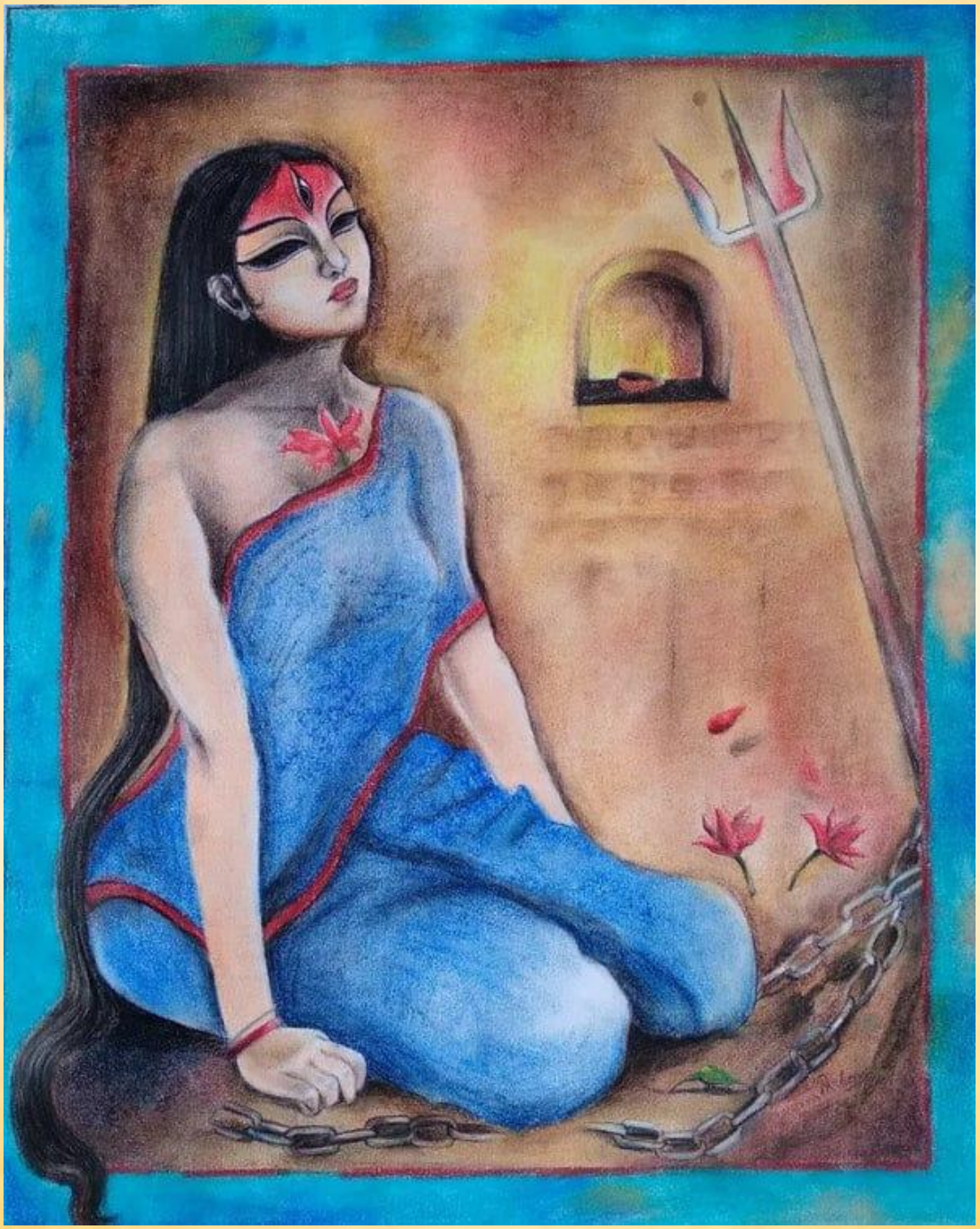

From Principal's Desk

I am very much delighted to share with you all that on the occasion of UNESCO certified Bengali's Greatest Festival "Durga Puja", the 3rd publication of SACM Sharodiya is going to be published on 24th September 2025 on the eve of Mahalaya – the Opening of "Devi Pokkha".

This Magazine – "SACM Sharodiya-2025" is the agglomerated effort and participation of faculty, staff and students of Saheed Anurup Chandra Mahavidyalay. From this year we have also put a special section for the children of all our colleagues in this magazine.

I believe that such type of initiative will increase the coordination and cooperation between teachers and students and will enrich the culture of heritage and ethos of language, which will equally enrich the extracurricular activities of the students.

I hope you will like the content and in future more such publications will be brought into light by the joint participation of all its stakeholder.

I wish you all a very happy Durga Puja. Best Wishes,

-Prof (Dr.) Santanu Kumar Sen Principal, SACM

সম্পাদকীয়

শারদ ঋতুর আকাশে শিউলির গন্ধ ভেসে উঠলেই বাঙালির হৃদয় জেগে ওঠে এক অনাবিল আনন্দে। দুর্গোৎসব কেবল ধর্মীয় আচার নয়, এটি বাঙালির সামগ্রিক সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতীক। এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত আছে মিলন, সম্প্রীতি, আনন্দ আর সৃষ্টির অমলিন বার্তা। আর সেই সৃষ্টিরই এক অনন্য রূপ হচ্ছে শারদ পত্র—যা দুর্গাপূজার মতোই বাঙালি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

দুর্গাপূজার ইতিহাসে একদিকে যেমন রয়েছে পৌরাণিক কাহিনি, অন্যদিকে রয়েছে সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ছাপ। আদি কালে ছিল রাজবাড়ি ও জমিদার বাড়ির আয়োজনে দুর্গাপূজা, যেখানে গৌরবময় আড়ম্বরের মধ্যেও সাধারণ মানুষের প্রবেশ সীমিত ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষভাগে ও বিশ শতকের গোড়ায় যখন বারোয়ারি বা সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সূচনা হলো, তখনই দুর্গাপূজা সত্যিকারের অর্থে 'জনপূজা'র রূপ পেল। স্বাধিকার আন্দোলনের দিনগুলোতে এই পূজা পরিণত হয়েছিল জাতীয় চেতনার মঞ্চে—মা দুর্গার রূপে মানুষ খুঁজে পেয়েছিল শৃঙ্খল ভাঙার শক্তি।

এই দুর্গোৎসবের সঙ্গে সমান্তরালে বেড়ে উঠেছে বাংলা শারদ পত্রিকা প্রকাশের ঐতিহ্য। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে রবীন্দ্রনাথের প্রবাসী পত্রিকার শারদ সংখ্যা এক নয়া দিগন্ত খুলে দেয়। এরপর দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, আনন্দমেলা কিংবা আনন্দলোক—প্রতিটি শারদ সংখ্যা হয়ে ওঠে সাহিত্যের নবীন-প্রবীণের মিলনক্ষেত্র। একদিকে প্রথিতযশা লেখকদের অমর সৃষ্টিগুলি, অন্যদিকে নতুন কলমের পরীক্ষা—সব মিলিয়ে শারদ পত্র বাংলা সাহিত্যচর্চার এক অমূল্য সম্পদ।

শারদ পত্র শুধু বিনোদন নয়, এটি এক বৃহৎ সৃজনশীল চর্চার ক্ষেত্র। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, নাটক কিংবা চিত্রকলা—সবই এখানে স্থান পায়। সমাজজীবনের প্রতিফলন যেমন দেখা যায়, তেমনি নতুন প্রজন্মের ভাবনা ও কল্পনার জগৎও এতে ধরা পড়ে। আজকের দিনে যেখানে ডিজিটাল মাধ্যম সাহিত্যপাঠের বড় অংশ দখল করেছে, সেখানেও শারদ পত্রের ছাপা অক্ষর ও পাতার ঘ্রাণ এক অন্যরকম আবেগ জাগিয়ে তোলে।

আমাদের শহীদ অনুরূপ চন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের শারদ পত্রও সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, প্রাক্তন ছাত্র এবং শুভানুধ্যায়ীদের যৌথ প্রয়াসে এই পত্রিকার প্রতিটি লেখা আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। এ এক মিলনমেলা—যেখানে জ্ঞানের আলো, সাহিত্যের রস, শিল্পের রূপ মিলেমিশে একাকার হয়।

এই পত্রিকার মাধ্যমে আমরা শুধু দুর্গোৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিই না, বরং বাংলার শারদ সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করি। ঐতিহ্যের সঙ্গে নবসৃষ্টির সেতুবন্ধন গড়ে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রয়াস আগামী দিনে আরও সমৃদ্ধ হবে, আমাদের পাঠক ও লেখক সমাজকে আরও নিবিড়ভাবে একসূত্রে বাঁধবে।

শারদীয় শুভেচ্ছা রইল সকলের প্রতি।

বিদ্যামন্দিরের বিবর্তন

সুনীপ কুমার মাইতি

বিদ্যামন্দিরের বিবর্তন --- এ শুধু অনুপ্রাসের কায়দা নয়। শেষ পঞ্চাশ বছরে পাঁচগুণ বেশি সময়ের বিবর্তন ঘটে গেছে যেন শিক্ষালয়ে। 'মা যেমন ছিলেন আর মা যেমন হইয়াছেন'-এর মতো উদ্বেগজনক বিবর্তন ঘটেছে। একটা সময় ছিল, শিক্ষকতায় তাঁরাই আসতেন, যাঁদের এই পেশায় নিজেকে সঁপে দেওয়ার প্রকৃত ইচ্ছা থাকত। সমাজের দরিদ্রতা তাঁদের গ্রাস করতে চাইলেও, প্রাপ্ত সম্মান দরিদ্রতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তাঁদের মুখে হাসি এনে দিত। পরিবারের চাহিদা মেটাতে চাকরি করলেও অর্থলোভী ছিলেন না কখনো। শিক্ষকতা তখনো ব্রত ছিল। বৃত্তি হয়ে ওঠেনি। শিক্ষার্থীদের মানুষ করে তোলা ছিল তাঁদের প্রধান ব্রত। শিক্ষার্থী বেয়াদবি বা পড়ায় অমনোযোগী হলে শিক্ষকেরা বুঝিয়ে বলতেন, কখনো বকা দিতেন, কোনো কিছুতে কাজ না হলে বেত্রাঘাত করতেন। তবু ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক ছিল মধুর। সেকালেও বেয়াড়া কিংবা দুষ্টু ছাত্র ছিল। মাথা ভালো দুষ্টু ছাত্ররা শিক্ষক মশায়দের অন্তঃকরণে পরম বিস্ময় উদ্রেক করত। একালের আঁতেল বেয়াড়া ছাত্ররা মাস্টার মশায়দের মনে চরম আতঙ্কের উদ্রেক করে। তখন উপযুক্ত দাওয়াই দিয়ে অমন ছাত্রদের মেরামত করা যেত। এখন সে-সব দাওয়াই ডোডো পাখির মতো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাকে ফেরানোর পথও বন্ধ। সমাজের সংখ্যা গরিষ্ঠরা তাকে ফেরাতে নারাজ। উদ্ভূত তিতিবিরক্তকর পরিস্থিতিতে শিক্ষককুলেরই একাংশ নারা লাগাচ্ছে এই বলে, --- পরের ছেলে পরমানন্দ যত উচ্ছন্নে যাবে তত আনন্দ।

সেকালে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের অনুকরণ করত, তাঁদের যোগ্য সম্মান করত। স্মার্টনেস কম দেখে কোনো শিক্ষকের পেছনে ব্যাকডেটেড বলে মুখ-টেপা হাসি সহযোগে টিপ্পনী কাটত না কদাচ। এখন এসব জলভাত। সেকালে শিক্ষক মশায়রা বকুনি এবং শাস্তি দিলে ছাত্ররা তা মাথা পেতে মেনে নিত। এখন শাস্তি দিতে গেলে শিক্ষককে শতবার ভাবতে হয়। ঠান্ডা মাথায় ক্যালকুলেশন করতে হয় শাস্তি দেওয়ার পর যে আফটার শক আসবে তা সইতে পারবেন কিনা।

পড়া না পারলে বিশেষ করে যদি কখনো শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হতো যেমন ক্লাস ফাঁকি, চুল বড় রাখা, ড্রেস ঠিক না থাকা, ক্লাসে কাউকে তিরস্কার বা মারামারি করা, তখন শিক্ষকেরা বুঝিয়ে বলতেন অথবা বেত্রাঘাত ছিল অন্যতম মহৌষধ। কারণ, কিশোর বয়সের দুরন্ত মন নিজের বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয় না। শিক্ষকের ভয়ে ছাত্ররা ক্লাসে শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ রচনা করত। নিজেদের মধ্যে মারামারি হলে মিটিয়ে নিত, শিক্ষকের কানে যাতে না পৌঁছায়, তার জন্য কত রকম পন্থা অবলম্বন করত। শিক্ষক মারামারির শাস্তি সবাইকে দিতেন। সে যেন আর্মির রুলস। কখনো কখনো শরীরে দাগ নিয়ে বাড়ি যেতে হতো। বাড়িতে গিয়ে শাস্তির ব্যাপারটা বেমালুম চেপে যাওয়াই ছিল দস্তুর। তা নাহলে বাড়িতেও কিছু উত্তমমধ্যম জুটতো। সেসব সুদিন গত হয়েছে অনেকদিন আগেই। সেকালে মাস্টার মশাই ক্লাসে ঢোকার আগেই চেয়ার টেবিল সাফ সুতোর করে রাখতে হতো। ছাত্ররাই তা করত। ছড়ির আকাল দেখা দিলে কিছু ছাত্রকে বরাত দিতেন শিক্ষকেরা। পরদিন গন্ডা দুই পাকা কঞ্চি নিয়ে আসতে হবে। অনুগত ছাত্রকুল সে নির্দেশের অন্যথা করে নি কখনো। আজকের

দিনে এসব নিছকই গল্প কথার মত শোনায়। এমনকি সম্মান দেখানোর জন্য চলন্ত সাইকেল থেকে লাফ দিয়ে নেমে যেত ছাত্ররা শিক্ষকদের দেখলে। রাস্তাঘাটে দেখা হলে শিক্ষকের চরণধূলি শিরোধার্য করা ছিল অবশ্যকর্ম। এইসব ব্যাপার স্যাপারকে সেকালে অতি ভক্তি বলে কটাক্ষ করার দুঃসাহস দেখায়নি কেউই। শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের আজ যেটুকু ভক্তি অবশিষ্ট আছে তা সেকালেরই ধ্বংসাবশেষ বিশেষ। এই ধ্বংসাবশেষটুকু কতদিন টিকে থাকবে সেটাই এখন দেখার।

একালে শিক্ষকদের ভেতরেও নীতিহীনতা ও চরিত্রহীনতার যথেষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। সমাজের সর্বব্যাপী অবক্ষয় থেকে শিক্ষককুল নিজেদের রক্ষা করতে অপারগ। আর যাঁরা এখনো শিক্ষকতা পেশায় নিজেদের আদর্শ বজায় রেখেছেন, তাঁদের সৎভাবে টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

Painting : Ahana Ghosh (BBIT Public School)

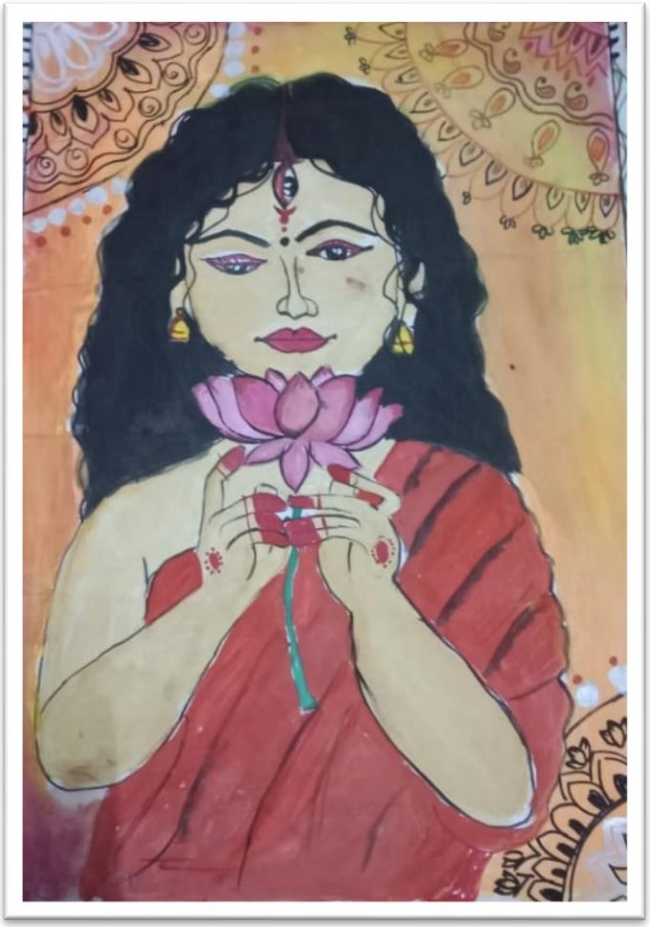

সাম্প্রতিক নেপালঃ একটি সতর্কবাণী

নিমাই পোদ্দার

সাম্প্রতিক কালে দক্ষিন এশিয়া তথা ভারতের তিন প্রতিবেশী দেশে প্রবল গণবিক্ষোভ ও হিংসা বিদ্যমান সরকার গুলির পতন ঘটিয়েছে। ঘটনা গুলির মধ্যে কিছু গুনগত তফাৎ থাকলেও মুলগত ভাবে সরকারে বিদ্যমান শাসকগোষ্ঠীর সীমাহীন দুর্নীতি ও অপশাসন-ই যে প্রধান কারণ সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। ২০২২ –এ প্রবল গনবিক্ষোভ ও হিংসা দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতিকে গদিচ্যুত করে। দু'বছর পর বাংলাদেশে একই ভাবে সরকার বিরোধী, হিংসা ও বিক্ষোভের ঢেউ প্রধানমন্ত্রীকে দেশছাড়া করে। দু'সপ্তাহ আগে গণ বিক্ষোরনে 48 ঘন্টার মধ্যে নেপালের প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়তে হয়েছে। প্রতিটি প্রতিবাদী আন্দোলন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে শুরু হয় এবং তা শেষ হয় সরকার তথা শাসকগোষ্ঠিকে পূর্ন প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারী ব্যবস্থার মধ্যেকার ব্যাপক দুর্নীতি ও বৈষম্যজনিত গনহতাশা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।

নেপালের ঘটনায় আমরা যা দেখলাম - 7ই সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া "জেন-জেড"-এর একটি সাধারণ প্রতিবাদী আন্দোলন কিভাবে 48 ঘন্টার মধ্যে কাঠমান্ডুতে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংসদ ভবন, সুপ্রীম কোর্ট, বিলাসবহুল হোটেল সহ প্রধান প্রধান সরকারী কার্যালয় ও ঐশ্বর্যের প্রতীক গুলিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দিয়েছে। কেবল কাঠমান্ডু নয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত প্রায় 300টি স্থানীয় সরকারী কার্যালয়ের ও একই পরিনতি হয়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের ওপর আক্রমন, ভাঙচুর, লুঠ সবই ঘটেছে, প্রাণ গেছে প্রায় 70 জনের। প্রায় 3000 কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। যা নেপালের মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক। সরকারী পরিষেবা ব্যবস্থার যেরূপ ধ্বংসসাধন ঘটেছে তা 2015-র ভূমিকম্পের সঙ্গে তুলনীয়, যেখানে প্রায় 9000 মানুষের মৃত্যু হয়। ঘটনাবলীর আকস্মিকতা আমাদের অবাক করলেও এর পেছনে সুনির্দিষ্ট আর্থ-রাজনৈতিক কারণ ছিল – সে আলোচনায় পরে আসা যাবে। বলা যায়, ক্ষোভের পারদ চড়তে চড়তে বারুদের স্তুপে অগ্নিসংযোগ ঘটে সরকারী একটি সিদ্ধান্তের কারণে। কে. পি. শর্মা ওলির নেতৃত্বাধীন সরকার যারা দেশে ফেসবুক, হোয়াটস-আপ, ইনস্টাগ্রাম সহ 26টি সমাজমাধ্যমের প্ল্যাটফর্মকে একসাথে নিষিদ্ধ ঘোষনা করে। উদ্দেশ্য সরকার বিরোধী অপপ্রচার বন্ধ করা। এই হঠকারী সিদ্ধান্তে 16-28 বছর বয়সী যুব জনতা এক লহমায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে – যার ফলশ্রুতি-এই গনবিস্ফোরণ।

আমরা যারা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে নেপালের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছি, দেখলাম যেন হঠাৎই একটা টাইম বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে। একটা গোটা দেশ জ্বলছে, একটা গোটা জাতি জ্বলছে। কারা জ্বালালো এবং ঘটালো এই ব্যাপক ও উন্মত্ত হিংসা? উত্তর 'জেন-জেড'। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক তারা এটা হঠাৎ করল কেন? একটু গভীরে ভাবলেই দেখবো, কেউ তাদের হাতের হাতের নাগালের মধ্যেকার প্রিয় 'খেলনা' – সমাজ মাধ্যমকে তাদের থেকে কেড়ে নিয়েছে, সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। একটু খেয়াল করলেই দেখবো এই 'জেন-জেড' –এর হাতে নেই কোন বই, খাতা, পেন এর বদলে কি আছে? আমরা জানি উত্তরটা মোবাইল ফোন। যার মাধ্যমে তারা প্রতিদিন, প্রতি মূহুর্তে, হাজার হাজার ঘন্টা ভুরি ভুরি রিল, কমেডি ক্লিপ, বডি শেমিং ইত্যাদি হাজারো অগভীর আবর্জনা সানন্দে হজম করছে। এখন ভাবুন শিশুর হাতের এরকম একটি প্রিয় খেলনা হঠাৎ যদি

কেউ কেড়ে নেয় তারা কি করে? তারা প্রচন্ড রেগে গিয়ে দিকবিদিগ জ্ঞান শূন্য হয়ে উৎপাত শুরু করবে। এখানেও এই অগ্নুৎপাতের পেছনে রয়েছে সেই একই কারণ – সমাজ মাধ্যমের নেশা ধরানো হাজারো উৎস থেকে অকস্মাৎ বিচ্ছিন্নতা। প্রশ্ন জাগে দায়ী কি শুধুই সমাজ মাধ্যম? আমরা কি ভেবে দেখেছি এক্ষেত্রে বাবা, মায়েদের প্রশ্রয়, সামাজিক গন্ডীহীনতা, মূল্যবোধ হীন শিক্ষার ভূমিকা কতটা? আমরা সবাই মিলেই এই উগ্র, অশান্ত, বৈর্ধ্যহীন, শ্রদ্ধাহীন, মূলহীন প্রজন্মকে তিলে তিলে গড়ে তুলছি, লালন পালন করছি। তাদের মধ্যে মিথ্যা অহমিকা তৈরীর সুযোগ করে দিচ্ছি। স্বভাবতঃই তারা নিজেদের দেশ, প্রকৃতি পরিবেশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, উৎসব কোন কিছুকেই সম্মান করতে শিখছেনা – এমনকি বাবা-মাকেও না। এটা গভীর উদ্বেগের বিষয়।

বারুদের স্তুপে অগ্নিসংযোগের দায় তো গেল– 'জেন-জেড' –এর উপর। এই বারুদের স্তুপের কথাটা বোধ হয় 'সাংহাই-কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন' –এর চীন বৈঠক থেকে এক সপ্তাহ আগে ফেরা প্রধানমন্ত্রী কে. পি. ওলি. ও আঁচ করতে পারেননি বা বলা যায় জানলেও উপেক্ষা করেছেন। আসলে এর পেছনে রয়েছে গভীর আর্থ-রাজনৈতিক কারণ-যেটা ওলির নেতৃত্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভকে বারুদের স্তুপ তথা আগ্নেয়গিরি-তে পরিণত করে।

নেপালকে আমরা চিনি-দক্ষিন এশিয়ার স্থল-বেষ্টিত একটি ছোট বৈচিত্রময় ভূমিরূপের দেশ হিসাবে। উত্তরে চীন এবং দক্ষিন পূর্ব ও পশ্চিমে ভারতের সীমানায় ঘেরা দেশটিতে রয়েছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট সহ সর্বোচ্চ দশটি পর্বতের আটটি। প্রায় তিন কোটি মানুষের বাস এখানে– যার পাঁচভাগের চার ভাগই হিন্দু ধর্মাবিলম্বী। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত শতকরা 70 ভাগই কৃষিনির্ভর এবং মোট দেশীয় উৎপাদনের শতকরা 42 ভাগই কৃষি উৎপাদন থেকেই আসে। মিশ্র অর্থনীতির এই দেশে পর্য্যটন, জলবিদ্যুৎ ও তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও দুর্বল পরিকাঠামো এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে এখানে শিল্পায়নের হার খুবই কম। দক্ষিন এশিয়ার দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে আফগানিস্তান –এর পরেই নেপাল। এখানকার মোট জাতীয় উৎপাদন (জি.ডি.পি.) র মাথাপিছু হার 1400 ডলার। বিশেষত গ্রামীন এলাকায় চরম দারিদ্র ও বেকারী যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে – সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চরম দুর্নীতি, বৈষম্য, অপশাসন ও রাজনৈতিক স্থায়িত্বের অভাব।

উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক ভাবে নেপালের ইতিহাস রাজতন্ত্রের উত্থান ও পতনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। বেশ কয়েক দশকের ভাঙা-গড়ার পর 1768 তে পৃথ্বীনারায়ন শা-র নেতৃত্বে নেপালে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রায় দুই শতক ব্যাপী কোন রকম প্রতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রন ছাড়াই চরম স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অধীনে শা রাজবংশের শাসন চলে। মাঝের কয়েক দশক 'রানা' রাজবংশের শাসনের প্রাধান্য থাকলেও 1951 তে পুনরায় ত্রিভুবন নারায়ন –এর নেতৃত্বে শাহ' রাজবংশ ক্ষমতা পুর্নদখল করতে সক্ষম হয়। 1959 এ সাধারন নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলেও তা ছিল স্বল্পস্থায়ী। 1960 এ ত্রিভূবন পুত্র রাজা মহেন্দ্র সংসদীয় গনতন্ত্র ভেঙে 'দলহীন পঞ্চায়েত' –এর নামে শাসন ব্যবস্থায় পূর্ন স্বৈরী ক্ষমতা জারী করে। এই সময় রাজনৈতিক দলগুলির ওপর ব্যাপক দমন পীড়ন এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্রম অবনয়ন ঘটে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে 1990 এর 'জন আন্দোলন' নেপালের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন মোড় এনে দেয়। পঞ্চায়েত ব্যাবস্থা'-র নামে চরম স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে গনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবীতে সারা দেশ উত্তাল হয়। ব্যাপক দারিদ্র ও কর্মহীনতা মানুষের মধ্যে সীমাহীন ক্ষোভ বিক্ষোভের জন্ম দেয়। এই গন উত্থানের সামনে রাজা

বীরেন্দ্র নতুন সংবিধান প্রনয়ন ও বহুদলীয় গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সম্মত হন। এরফলে কার্যত 1991 তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নেপালে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সূচনা ঘটল।

ইতিমধ্যে দেশে মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদকে সামনে রেখে পুনরায় 1990 র শেষের দিকে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। রাজপ্রাসাদের মধ্যেই রাজা বীরেন্দ্র-র বিতর্কিত হত্যাকান্ড এবং তার পুত্র রাজা জ্ঞানেন্দ্রের সিংহাসনে আরোহনের মত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য যে জ্ঞানেন্দ্রের নেতৃত্বেও একই ভাবে স্বৈরী রাজতান্ত্রিক শাসন 2005 এ নেপালে পুনরায় 'জন আন্দোলন'-এর বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। ফলস্বরূপ 2008 এর মে মাসে নেপালে পাকাপাকি ভাবে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় গনতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। 2015 তে গৃহীত নেপালের নবতম সংবিধান অনুযায়ী দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার নিম্ন কক্ষ প্রতিনিধি সভা গঠিত হয়। মোট 275 আসনের মধ্যে 165 জন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে এবং 110 জন সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এত পরিবর্তনের পর গনতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা স্বত্বেও নেপালে কোন সরকারই পূর্ন সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে নি। 2015 –র পর চতুর্থবারের জন্য নেপালের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা কে. পি. ওলি নেপালের কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মাওবাদী গেরিলা নেতা পুষ্প কমল দাহেল ওরফে প্রচন্ডকে উৎখাত করে দেশের শাসনক্ষমতা অধিকার করেন। 14 বার সরকারে পরিবর্তন স্বত্তেও শেষ প্রধানমন্ত্রী কে. পি. ওলি পারেন নি বৈষম্য কমাতে এবং দুর্নীতি ও অপশাসনের সমাপ্তি ঘটাতে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থার প্রতি নেপালী জনগন পুনরায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সামিল হয় এবং তীব্র গনবিক্ষোভও ব্যাপক হিংসাত্বক ঘটনার মাধ্যমে ওলির নেতৃত্বাধীন সরকারের পতন ঘটে।

আমরা দেখলাম 'জেন-জেড' এর এই ভয়ানক গনবিক্ষোভ রাষ্ট্রপতি ও সেনাবাহিনীকে বাধ্য করেছে তদারকী সরকারের প্রধান হিসাবে সুপ্রীমকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কিকে নিয়োগ করতে। লক্ষ্য দুর্নীতি ও সমস্ত প্রকার ব্যার্থতার অবসান ঘটিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতার সাথে মানুষের জীবনিধারণের মান উন্নত করা। একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো, নেপালে এই প্রথম সেনাবাহিনীকে এক নতুন ভূমিকায় দেখা গেল। প্রশ্ন হল সেনা বাহিনী কি সক্ষম হবে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষকে শান্তি প্রক্রিয়ায় আহ্বান জানিয়ে আলোচনার টেবিলে বসাতে - নাকি ইতিহাসের এই শিক্ষা কে তারাও প্রত্যাখ্যান করবে। এখানেই লুকিয়ে আছে নেপালের বর্তমান অচলাবস্থার অবসানের সম্ভাবনা। 'জেন-জেড'–এর বিস্ফোরণ নেপালের সমস্ত রাজনৈতিক শক্তির কাছে যেমন এক সতর্কবানী – তেমনি আমাদের দেশ, রাজ্য-তথা প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার শাসনক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত তাদের সবার কাছেই এক সতর্কতা সূচক বিজ্ঞপ্তি – এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মগজ ধোলাই

অধ্যাপক গোপাল দেব কণ্ঠ

(১)

গত ২০ আগস্ট ইউ.জি.সি.চেয়ারম্যান বিনীত যোশী"Learning outcomes based curriculum framework" (LOCF) সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন। আগামী ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেশবাসীর কাছে মতামত চেয়েছে। মূলত: পাঠ্যক্রমে ভারতীয় জ্ঞানচর্চা নামে ৯ টি প্রাচীন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো - গণিত, রসায়ন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান,গৃহ বিজ্ঞান,শারীরবিদ্যা, বাণিজ্য, অর্থনীতি, ভূগোল ও নৃতত্ত্ব বিদ্যা। প্রস্তাবে প্রাচীন ভারতীয় গণিতে অন্তর্ভুক্ত হবে বৈদিক গণিত, ভারতীয় বীজ গণিত, জ্যামিতিক মডেলের ধারণা, মৌলিক সংখ্যার ব্যবহার এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

(২)

ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী বাণিজ্যের ধারণা,গুরুকূল ব্যবস্থা এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে। অর্থনীতির পাঠ্যক্রমে থাকবে সম্পদ সংক্রান্ত ধর্মীয় ব্যাখ্যা। রসায়নে পড়তে হবে ভারত থেকেই পরমাণু ধারণা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। সুরা সংক্রান্ত বিষয়ে অধ্যায়ে থাকবে কাঞ্জি, মহুয়ার রাসায়নিক গঠন ও তার গুনাগুন। নৃতত্ত্বকে উপনিবেশিক প্রভাব মুক্ত করে ভারতীয়করণ করা হবে। পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে চড়ক, সুশ্রুত,বুদ্ধ, মহাবীরের বানী। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বৈষম্যের সংজ্ঞা পরিবর্তন করা হচ্ছে। শুধু মাত্র তফসিলি জাতি ও উপজাতি মানুষের উপর আক্রমণই বৈষম্য হিসেবে গণ্য হবে। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে রাম রাজ্যের কথা অন্তর্ভুক্ত হবে। ব্রিটিশ বিরোধী ঔপনিবেশিক সংগ্রামে তথ্য -সূত্র - গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হবে ব্রিটিশকে ৬ বার মুচলেকা দেওয়া সাভারকারের লেখা,"দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অব ইনডিপেন্ডেন্স"।

(৩)

শিক্ষায় গৈরিকীকরণের নিলজ্জ প্রচেষ্টা LOCF খড়সা প্রতিবেদনে পরিস্ফুট হয়েছে। 'বৈশেষিক সূত্রে'র রচয়িতা কণাদ হলেন বিশ্বের প্রথম পরমাণু বিজ্ঞানী।সুশ্রুত ছিলেন প্রাচীন ভারতের প্লাস্টিক সার্জারির জনক। রসায়নের পাঠ্যসূচির নির্দেশিকা শুরু হয়েছে সরস্বতী বন্দনার মাধ্যমে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত হবে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন কথা কাহিনী। এটা কি সংবিধান বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতা উপর আঘাত নয়? স্নাতক স্তরের পাঠ্যক্রমে ৯ বিষয়ের উপর ইউ জি সি সরাসরি বিজ্ঞান চেতনার উপর আঘাত নামিয়ে এনেছে। গণিত সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হবে 'সূর্য সিদ্ধান্ত ','আর্যভট্টীয়', ' সিদ্ধান্ত শিরোমণি '। কোয়ান্টাম ফিজিক্সের যুগে এই চর্চা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। ম্যানেজমেন্টের অত্যাধুনিক উদ্ভাবন যখন বাণিজ্য নতুন মাত্রা পাচ্ছে তখন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সময়ের সাপেক্ষে অচল বললে অত্যুক্তি হবে না। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিভাবে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যাবে তা নিয়ে যখন দুনিয়ার আলোচ্য বিষয়,তখন প্রাচীন ভারতের পরমানু তত্ত্ব নিতান্তই পশ্চাৎপদ।

স্পেনে ফ্রাঙ্ককোর স্বৈর শাসনে ক্যাথলিক চার্চের বিরোধীতা বাতিল হয়েছিল ডারউইনের তত্ত্ব।আর আজ আমাদের দেশে একইভাবে ব্রাত্য ডারউইনবাদ।বাদ দেওয়া হয়েছে সুলতানি ও মুঘল আমলকে।অথচ সংবিধানে বলা হয়েছে যে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলা।ইউ জি সি ভূমিকাও একপেশে বলে প্রতিফলিত হচ্ছে। সম্প্রতি LOCF খড়সা প্রতিবেদনের মাধ্যমে পাঠ্যসূচিতর পুরোটাই নির্ধারণ করতে চাইছে UGC। এই প্রচেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর সরাসরি আঘাত।

(৪)

জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী জোর দেওয়া হয়েছে Multi- Disciplinary Course উপর। LOCF খসড়া তিনটি ভাগে পাঠ্যক্রমেকে ভাগ করা হয়েছে।(১) ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক কোর (২) ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ (৩) জেনারেল ইলেকটিভ অর্থাৎ ঐচ্ছিক সাধারণ বিষয় - প্রধান বিষয়ের বাইরে অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত পাঠ্যক্রম।

প্রতিটি বিষয়ে সিবিসিএস পদ্ধতি অনুয়ায়ী ক্রেডিট পয়েন্ট নির্দিষ্ট করা হয়েছে।B.Sc. Chemistry ক্ষেত্রে Credit score 96 point বরাদ্দ ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক কোরের জন্য। ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ জন্য বরাদ্দ মাত্র ৯ পয়েন্ট। অর্থাৎ মুখে Multi-Disciplinary (বহু -বিষয়ক) বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে পাঠ্যসূচিকে সাজানো হয়েছে মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে।

LOCF এই খড়সা প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে সারা দেশে শিক্ষা মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।একে অবৈজ্ঞানিক, অপ্রাসঙ্গিক ও পশ্চাৎপদ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

২০২০ সালে করনা অতিমারীর সময় কারোর সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে নয়া শিক্ষা নীতি চালু করা হয়।এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষায় গৈরিকীকরণ, কেন্দ্রীকরণ ও বেসরকারিকরণ। নতুন শিক্ষা নীতিতে সংবিধানের মর্মবস্তু গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দদ্বয়ের কোন উল্লেখ নেই। ভারতের মতো বহুত্ববাদী দেশেকে তুলে ধরা হচ্ছে,"এক দেশ,এক বোর্ড" এর মডেল।এর ফলেই আমাদের রাজ্যে স্নাতক-স্নাতকোত্তর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ছাত্র শূন্যতায় ভোগা শুরু হয়েছে। উচ্চশিক্ষার মুখী ছাত্ররা হতে চাইছে না।তারা ভবিষ্যতে কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না। সর্বনাশের কারণ এখানেই।

(৫)

একদিকে বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজির তোষণ অন্যদিকে " হিন্দু - হিন্দি - হিন্দুস্তানের" একমাত্রিকতার দিকে দেশকে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা। আসলে পাঠ্যসূচির এই দেশের গনতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বহুত্ববাদ ও বিজ্ঞান মনস্কতার উপর আঘাত। দেশের শিক্ষার স্বার্থেই LOCF এর প্রতিবাদের প্রয়োজন আর প্রতিবাদের আগুনেই পরাজিত হবে নতুন প্রজন্মের মগজ ধোলাইয়ের অপচেষ্টা।

Painting : Archini Das

কোমাগাতা মারু ঘটনাঃ ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে এক অনন্য প্রতিবাদ

দেবাশীষ বেরা, ইতিহাস বিভাগ

এই প্রবন্ধটি কোমাগাতামারু জাহাজের ভাগ্যবান যাত্রার বর্ণনা এবং এতে সংঘটিত বর্ণবৈষম্য ও অনিশ্চয়তা তুলে ধরে। পুরো ঘটনা ভারতীয়দের, বিশেষ করে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগিয়ে তোলে, যা গদর আন্দোলনকে প্রভাবিত করে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। সেই সাথে এই ঘটনা ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এক সাহসী প্রতিবাদ এবং ভারতীয় অভিবাসীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইহা একেবারে অনালোচিত বিষয় তা নয়, এই প্রবন্ধে আমি জানাতে চাইছি আন্তরজাতিক এই ঘটনা কিভাবে স্থানীয় সমসাময়িক রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। আদি গঙ্গার তীরে গড়েওঠা মূলত একটি শিল্প ও বন্দর এলাকা 'বজবজ' কিভাবে আন্তরজাতিক চরিত্র পেয়েছিল। কিভাবে বজবজ হঠাৎ করে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও উপনিবেশবাদবিরোধী আন্দোলনের একটি জীবন্ত মঞ্চ হয়ে উঠেছিল। সমগ্র এই যাত্রার একটি সাধারণ কাঠামো এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা শোষণ, বর্ণবৈষম্য এবং এর পরিণতিগুলি ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের প্রসারের অনুঘটক হিসেবে উঠে এসেছে।

দক্ষিণ এশীয়দের অভিবাসন ইতিহাস

উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের শুরুর দিকে দক্ষিণ এশীয়দের বিশেষত পাঞ্জাবি শিখদের কানাডায় অভিবাসনের ইতিহাস একদিকে যেমন সাহসিকতা ও সংগ্রামের কাহিনি, অন্যদিকে তেমনি বর্ণবাদ, বৈষম্য ও নিষেধাজ্ঞার ইতিহাস। ভারত, বিশেষত পাঞ্জাব অঞ্চল তখন ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিখরা, বিশেষ করে পাঞ্জাবি শিখ পুরুষরা ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তাদের সাহস, আনুগত্য ও সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল ব্রিটিশদের কাছে মূল্যবান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতীয়দের অনেক দেশেই কাজ করতে পাঠানো হতো, যেমন - মালয়েশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, ফিজি, ক্যারিবিয়ান, এবং ধীরে ধীরে উত্তর আমেরিকাতেও। অধিকাংশ ভারতীয়, বিশেষ করে পাঞ্জাবিরা, উন্নত জীবনের আশায়, অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও জমি কেনার স্বপ্নে কানাডার দিকে আকৃষ্ট হন। শিখ পাঞ্জাবি পুরুষরা মূলত হংকং, সিঙ্গাপুর বা অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে প্যাসিফিক রুটে কানাডায় প্রবেশ করেন। তারা মূলত ব্রিটিশ কলম্বিয়া (বিশেষ করে ভ্যাঙ্কুভার) অঞ্চলে কাজ করতে শুরু করেন, যেমন - লকিং ইন্ডাস্ট্রি (sawmills), রেলপথ নির্মাণ (Canadian Pacific Railway), কৃষিকাজ ও নৌকায় শ্রম।

যদিও প্রথম দিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পাঞ্জাবিদের 'ব্রিটিশ প্রজা' হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তবুও স্থানীয় জনমনে অচিরেই বর্ণবাদ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপীয় অভিবাসীরা মনে করত ভারতীয়রা 'শ্বেত ক্যানাডা'-র আদর্শের জন্য হুমকি। ভারতীয়দের আলাদা রাখা হত, অনেক সময় বসবাসের জন্য জায়গা ভাড়া দিত না, সামাজিক মেলামেশাও সীমিত ছিল। 'Continnuous Journey Regulation (1908)' আইন অনুযায়ী, অভিবাসীরা যদি একটি দেশ থেকে টানা ভ্রমণ করে না আসে, তাহলে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বাস্তবে, ভারত থেকে সরাসরি কানাডায় আসার কোনো জাহাজ পথ ছিল না। ফলে এটি ছিল একটি কৌশলগত বর্ণবাদী আইন। আবার 'Head Tax & Literacy Test' আইন অনুসারে ভারতীয়দের কানাডায় প্রবেশ নিরুৎসাহিত করতে বিভিন্ন আর্থিক ও প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি করা হয়।

যাত্রার সূচনা

গুরদিত সিং সান্ধু (১৮৫৯-১৯৫৪) ছিলেন কোমাগাতা মারু ঘটনার প্রধান উদ্যোক্তা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন প্রভাবশালী পাঞ্জাবি শিখ ব্যবসায়ী, সমাজসংস্কারক এবং রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি, যিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করতেন। তাঁর জন্ম ১৮৬০ সাল পাঞ্জাবের শ্রামপুর গ্রামে। তাঁর ধর্ম ছিল শিখ। তিনি পেশায় ব্যবসায়ী ও শিপিং উদ্যোক্তা। পেশাগত কারনে তিনি মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে বসবাস করেছিলেন। ১৯০৮ সালের 'Continuous Journey Regulation' অনুযায়ী ভারতীয়দের সরাসরি কানাডায় প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়। গুরদিত সিং বিশ্বাস করতেন, ভারতীয়রা যেহেতু ব্রিটিশ প্রজাস্বত্ব ভুক্ত, তাই তাদেরও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার থাকা উচিত। তিনি জাহাজ নিয়ে কানাডার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে চেয়েছিলেন মূলত একটি রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে। এই যাত্রা শুধুমাত্র অভিবাসনের চেষ্টা নয়, বরং তা ছিল বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক ব্রিটিশ-প্রণীত অভিবাসন আইনের বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ।

তার দৃষ্টিতে, অভিবাসন কোনো দয়া নয়, একটি ন্যায্য ও আইনসম্মত অধিকার। তিনি মনে করতেন, কানাডায় পাঞ্জাবি ও ভারতীয় অভিবাসীরা শুধু শ্রমিক নয়, সমান নাগরিক অধিকার পাওয়ার যোগ্য। সেই সাথে তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি ঘটনা ঘটাতে, যা আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং ভারতীয় অভিবাসীদের প্রতি অবিচার ও বৈষম্যকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরবে। কোমাগাতা মারু ছিল সেই প্রতিবাদের প্রতীক।

গুরদিত সিং

যাত্রাপথে কোমাগাতা মারু

এই আশা ও স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার লক্ষে তিনি কানাডার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পরিকল্পনা করেন। জাপানের কোবি শহর থেকে প্রায় ১৪,০০০ কানাডিয়ান ডলারে (সমসাময়িক মূল্যে প্রায় ৩ লাখ টাকার সমান) জাপানি মালিকানাধীন জাহাজ ভাড়া নিয়েছিলেন। জাহাজটির মালিক ছিল Shinyei Kisen Kaisha নামের জাপানি কোম্পানি। জাহাজের নাম ছিল 'এস এস কোমাগাতা মারু'। কৌশলগত কারণেই কোবি বন্দরকে বেছে নেওয়া হয়, কারণ এটি তখন জাহাজ চলাচলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বন্দর এবং এশিয়া থেকে উত্তর আমেরিকায় যাত্রার উপযুক্ত রুট ছিল। ১৪,০০০ কানাডিয়ান ডলার যা ছিল অত্যন্ত বড় অঙ্কের অর্থ। এই টাকা গুরদিত সিং নিজেই দেন নি, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং ও ভারতের সমর্থকদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। বিশেষ করে শিখ প্রবাসী সমাজ তার প্রচেষ্টায় আর্থিকভাবে সাহায্য করে।

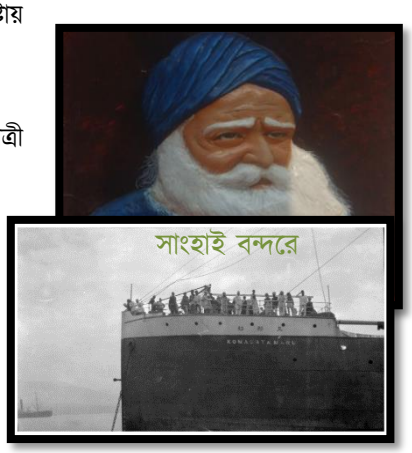

গুরদিত সিং ১৯১৪ সালের ৪ এপ্রিল জাপানের কোবি বন্দর থেকে ১৬৫ জন যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। এর পর চীনের সাংহাই বন্দরে এসে কিছু যাত্রী তোলেন। যাত্রী তোলার জন্য এর পর জাহাজটি চীনের হংকং বন্দরে আসে। এখানেও অনেকে জাহাজে ওঠে। হংকং এর পর জাপানের ইয়োকোহামায় আরো কিছি যাত্রী নিয়ে সরাসরি কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে এসে পৌছায় ২৩ মে ১৯১৪। জাহাজে মোট যাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৭৬ জন। এর মধ্যে শিখ ৩৪০ জন, মুসলিম ২৪ জন ও হিন্দু ১২ জন। এরা সবাই ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের নাগরিক, এবং তাদের অধিকাংশই পাঞ্জাবি কৃষক ও শ্রমিক, যারা উত্তর আমেরিকায় কাজ ও বসবাসের আশায় যাত্রা শুরু করেছিলেন।

ভ্যাঙ্কুভার বিদ্রোহ

কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে ১৯১৪ সালের ২৩শে মে যখন কমাগাতা মারু জাহাজ এসে পৌঁছায়। এর পর থেকে শুরু হয় এক দীর্ঘ, উত্তেজনাপূর্ণ ও ইতিহাসগর্ভ রাজনৈতিক নাটক। জাহাজ যাত্রীরা যাতে কানাডার মাটিতে পা দিতে না পারে তার জন্য কানাডা প্রশাসনের সাথে সাথে সেখানের সাধারন জনতাও বিরোধিতা করতে এগিয়ে এসেছিল। বন্দর তীরবর্তী কানাডার উপকুলে ব্যাপক ভিড় দেখা যায়। অন্যদিকে গুরদিত সিং ও তাঁর সহযোগীরা এই অন্যায্য বিরোধিতার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কানাডিয়ানদের এই প্রতিবোধের বিরুদ্ধে গুরদিত আদালত পর্যন্ত যান। দীর্ঘ দুমাস ধরে খাদ্য ও পানীয় সংকট উপেক্ষা করে তারা কানাডায় প্রবেশ করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তা বিপ্লবের সামিল। তাই ভ্যাঙ্কুভার বন্দরের এই প্রতিরোধ ও লড়াইকে 'ভ্যাঙ্কুভার বিদ্রোহ' বলে এখানে আমি উল্লেখ করছি।

ভ্যাঙ্কুভারে কানাডিয়ানদের প্রতিবাদ

এই ঘটনাটি শুধু একটি অভিবাসন সংকট ছিল না, বরং বর্ণবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, রাজনৈতিক প্রতিরোধ ও মানবাধিকারের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। কানাডীয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে যে যাত্রীরা 'Continuous Journey Regulation' লঙ্ঘন করেছেন। এই আইন অনুযায়ী, কেউ যদি একটানা (non-stop) ভ্রমণ না করে কানাডায় আসে, তবে তাকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। এটি ভারতীয়দের ঠেকানোর জন্য বিশেষভাবে তৈরি বর্ণবাদী আইন ছিল। বাস্তবে, ভারত থেকে সরাসরি কানাডা আসার কোনো জাহাজ রুট ছিল না, কাজেই এই আইন একধরনের আইনি ফাঁদ ছিল। দুই মাসের বেশি সময় ধরে জাহাজটি ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে আটকে থাকে। যাত্রীরা জাহাজে আটকে ছিলেন। খাদ্য, জল, ওষুধ, চিকিৎসা ও যোগাযোগের তীব্র সংকট ছিল। কানাডীয় পুলিশ ও নেভাল বাহিনী জাহাজ ঘিরে ফেলে। গুরদিত সিং এবং তার সমর্থকরা আইনি লড়াই শুরু করেন। গুরদিত সিং ও তার আইনজীবীরা দাবি করেন, যেহেতু যাত্রীরা ব্রিটিশ প্রজা, তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যেকোনো অংশে যাওয়ার অধিকার রাখে। কানাডার আদালত এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। ৬ই জুলাই, ব্রিটিশ কলম্বিয়া কোর্ট অব অ্যাপিল রায় দেয় যে 'প্রচুর সংখ্যায় প্রাচ্যবাসীকে গ্রহণ করা মানে হবে শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ জাতির বিলুপ্তি'।

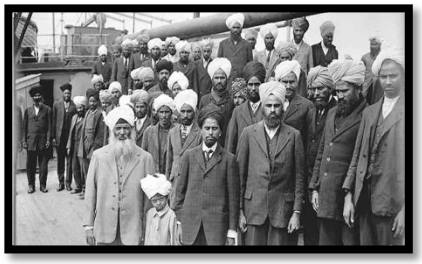

কনজারভেটিভ এম. পি. এইচ. এইচ. স্টিভেন্স জাহাজের যাত্রীদের নামার অনুমতি দেওয়ার বিরুদ্ধে একটি জনসভার আয়োজন করেন এবং সরকারকে জাহাজটিকে থাকতে না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। স্টিভেন্স অভিবাসন কর্মকর্তা ম্যালকম আর. জে. রিডের সাথে কাজ করে যাত্রীদের সমুদ্রতীরে রেখে দেন। রিডের একগুঁয়েমি জাহাজের যাত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহারের দিকে পরিচালিত করে এবং এর প্রস্থানের তারিখ দীর্ঘায়িত করে, যা ফেডারেল কৃষিমন্ত্রী, ইয়েলের এমপি মার্টিন বারেল ক্যারিবুর হস্তক্ষেপ না হওয়া পর্যন্ত সমাধান করা হয়নি। কানাডায় ইতিমধ্যেই বসতি স্থাপনকারী কিছু দক্ষিণ এশীয় কানাডিয়ান হুসেন রহিম, মুহাম্মদ আকবর এবং সোহান লাল পাঠকের নেতৃত্বে 'শোর কমিটি' গঠন শুরু করেন। কোমাগাতা মারু যাত্রীদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ইহা তৈরি করা হয়েছিল। তারা কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেকগুলি প্রতিবাদ সভা করে। ভ্যাঙ্কুভারের ডোমিনিয়ন হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকগুলির মধ্যে একটিতে সমাবেশ সিদ্ধান্ত নেয় যে, যাত্রীদের কানাডায় প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া হলে, ইন্দো-কানাডিয়ানদের তাদের অনুসরণ করে ভারতে ফিরে যেতে হবে এবং 'গদর বিদ্রোহ' শুরু করতে হবে । সভায় অনুপ্রবেশকারী একজন ব্রিটিশ সরকারি এজেন্ট লন্ডন এবং অটোয়ার সরকারি কর্মকর্তাদের টেলিফোন করে জানান যে গদর পার্টির সমর্থকরা জাহাজে রয়েছে। এই ঘটনার পর যাত্রীদের প্রতি অসহনীয় আচরন শুরু হয়।

নেতৃত্বে গুরদিত সিং

জাহাজ ভাড়া করার জন্য তীরবর্তী কমিটি ২২,০০০ ডলার কিস্তি হিসেবে সংগ্রহ করে। তারা যাত্রীদের একজন মুন্সি সিংয়ের পক্ষে জে. এডওয়ার্ড বার্ডের আইনি পরামর্শের অধীনে একটি মামলাও দায়ের করে। ৬ জুলাই, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া আপিল আদালতের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সর্বসম্মত রায় দেয় যে, নতুন আদেশ-ইন-কাউন্সিলের অধীনে ইমিগ্রেশন এবং উপনিবেশকরণ বিভাগের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার তাদের নেই। ক্ষুব্ধ যাত্রীরা জাপানি ক্যাপ্টেনকে জাহাজের নিয়ন্ত্রণ থেকে অব্যাহতি দেয়, কিন্তু কানাডিয়ান সরকার বন্দর টাগ সি. লায়নকে জাহাজটিকে সমুদ্রে ঠেলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। ১৯ জুলাই, ক্ষুব্ধ যাত্রীরা আক্রমণ শুরু করে। পরের দিন ভ্যাঙ্কুভার সংবাদপত্র 'দ্য সান' রিপোর্ট করে, 'হিন্দুদের চিৎকারে পুলিশ সদস্যদের উপর কয়লা এবং ইটের স্তূপ বর্ষণ করে। ... এটি কয়লার পাতির নীচে দাঁড়িয়ে থাকার মতো ছিল'।

কর্তৃপক্ষের দাবি ছিল, যাত্রীরা কানাডার 'প্রাচ্য স্বভাব' যেমন—নৈতিক অবক্ষয়, অপরিচ্ছন্নতা, উগ্রতা ও রোগপ্রবণতার কারণে কানাডিয়ান সমাজে মিশে যেতে অযোগ্য। শুধু ২০ জন যাত্রীকে কানাডায় নামার অনুমতি দেওয়া হয়। বাকিদের ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কানাডার প্রধান পত্রিকাগুলো যাত্রীদের অসভ্য, অবাঞ্ছিত, এমনকি বিপ্লবী হিসেবে তুলে ধরে। অনেক শ্বেতাঙ্গ কানাডীয় বিক্ষোভ করে, তারা চায় না ভারতীয়রা সেখানে বসবাস করুক। যদিও এই ধরনের মনোভাব কোমাগাতা মারুর আগমনের আগেই বিদ্যমান ছিল, তবুও এই জাহাজটির আগমন যেন ২০শ শতকের গোড়ার দিকে তথাকথিত 'হিন্দু হুমকি' এবং 'এশীয় জনস্রোত' দ্বারা কানাডা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ছিল।

কানাডার জলসীমায় কোমাগাতা মারুর আগমন সেখানকার গণমাধ্যমে এক অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে। এটি জনমত গঠনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে মনে করা হয়। কারণ যাত্রীদের সঙ্গে কানাডিয়ানদের সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ ছিল না বললেই চলে। ফলে সাধারণ জনগণের জন্য একমাত্র তথ্যসূত্র ছিল সংবাদপত্র। তাই গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা অন্তত পক্ষে জনমানসে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ছিল তা বুঝতে পারি। কোমাগাতা মারুকে ঘিরে সংবাদমাধ্যমে বর্ণগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো কতটা ও কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা অনুমেয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোমাগাতা মারুকে রাজনৈতিক হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেছিল।

যাত্রীরা দাবি করেন, ব্রিটিশ প্রজারূপে তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে অবাধে চলাচলের অধিকার রয়েছে। এই দাবি কানাডীয় কর্তৃপক্ষের জন্য জটিলতা তৈরি করে, কারণ তারা অশ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের বাদ দিতে চাইলেও, একে কেন্দ্র করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির ঝুঁকিও নিতে চাইছিল না। কানাডার কর্মকর্তারা এই যাত্রাকে 'রাজনৈতিক' হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং আশঙ্কা করেন যে যাত্রীরা বিপ্লবী মতাদর্শে বিশ্বাসী, যা ব্রিটিশ কলম্বিয়ার দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্য জন্ম নেওয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদী গদর আন্দোলনকে আরও গভীর করতে পারে। গদর পার্টি ছিল সান ফ্রান্সিসকোভিত্তিক একটি রাজনৈতিক সংগঠন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহের ডাক দিত। একই সময়ে, যাত্রীদের অধিকাংশই ছিলেন শিখ। ব্রিটিশরা পাঞ্জাবি শিখ সেনাদের প্রতি সম্মান দেখাত তাদের ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি আনুগত্য, পুরুষত্ব এবং খালসা নীতিতে বিশ্বাসের কারণে। শিখ যাত্রীরা আশা করেছিলেন, এই ঐতিহাসিক আনুগত্য তাদের কানাডায় বসবাসের অধিকার নিশ্চিত করবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের 'বিপজ্জনক বিপ্লবী' হিসেবে দেখলেও, তাদের মধ্যে থাকা একদিকে সাম্রাজ্যবিরোধিতা এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ আনুগত্যের এই দ্বৈততা বিষয়টিকে জটিল করে তোলে। যদিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখার ইচ্ছা তাদের কোমাগাতা মারুকে আগমনের সাথে সাথেই সহিংসভাবে ফিরিয়ে দেওয়া থেকে বিরত রাখে, তবুও তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত বৈরী।

বজবজ বিপ্লব

ভ্যানকুভারে দুই মাস আটকে থাকার পর ২৩ জুলাই ১৯১৪-এ কানাডিয়ান নৌবাহিনীর HMCS Rainbow যুদ্ধজাহাজ এবং একজন টাগবোট দ্বারা জাহাজকে বের করে আনা হয় এবং এটি ভারতের পথে রওনা হয়। জাহাজটি জাপান-হংকং-চীন-মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর হয়ে বঙ্গোপসাগর দিয়ে গঙ্গার পথ ধরে কলকাতার নিকট বজবজ বন্দরে এসে পৌছায় ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪।

এখন প্রশ্ন আসতেই পারে, ব্রিটিশ কতৃপক্ষ কেন জাহাজটিকে বজবজে এনে ভিড়িয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথম এবং প্রধান যুক্তি ছিল ব্রিটিশ স্বার্থ। কোমাগাতা মারুর যাত্রীরা ছিলেন মূলত পাঞ্জাবি, যাদের অনেকেই গদর আন্দোলনের সঙ্গে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার আশঙ্কা করছিল যে জাহাজ থেকে ফিরে আসা যাত্রীরা ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে, বিশেষ করে পাঞ্জাব অঞ্চলে। সেই কারণে ব্রিটিশ সরকার চাইছিল একটি প্রধান ও সামরিকভাবে সুরক্ষিত বন্দর দিয়ে তাদের আগমন ঘটাতে, যাতে প্রথমেই পুলিশের নজরদারি ও দমনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া যায়। কলকাতা ও বজবজ এর আশেপাশে তখন ব্রিটিশদের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল, যা ভারতের পশ্চিম বা দক্ষিণ দিকের ছোট বন্দরগুলোর চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল।

দ্বিতীয় যুক্তি হিসাবে বলা যায়, ব্রিটিশ ভারতের প্রধান বন্দরগুলোর একটি ছিল কলকাতা। কলকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রশাসনিক ও সামরিক কেন্দ্র, এবং পূর্বে (১৯১১ পর্যন্ত) ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল। বজবজ হল হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত কলকাতার একটি নিকটবর্তী বন্দর, যেখানে অনেক জাহাজ কলকাতা ঢোকার আগে এখানে থামে। অতএব, যদি কোনো রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর জাহাজ ফেরত আসে কলকাতা অঞ্চলে তা নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ ছিল ব্রিটিশদের জন্য। কলকাতার বন্দরে ঢোকার আগে বজবজ ছিল একটি প্রাকৃতিক পয়েন্ট যেখানে জাহাজকে থামিয়ে যাত্রী নামানো ও পরীক্ষা করা যেত। ব্রিটিশ সরকার আগে থেকেই কোমাগাতা মারু ফেরত আসবে বলে ধারণা করেছিল এবং তারা ঠিক করেছিল, জাহাজকে কলকাতার আশেপাশে রাখা হবে যাতে বিদ্রোহ হলে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ নেওয়া যায়। সেই কারণে বজবজ রেলস্টেশনেই একটি বিশেষ ট্রেন রাখা ছিল, যাত্রীদের সরাসরি পাঞ্জাবে পাঠানোর জন্য। কিন্তু যাত্রীরা সেই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেন, ফলে বজবজ সংঘর্ষ ঘটে।

১৯১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জাহাজ হুগলি নদীর মোহনায় প্রবেশ করে ও ২৯ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২ টায় বজবজে পৌঁছায়। যাত্রীদের জাহাজ থেকে উঠতে বলা হয়, কিন্তু তারা কলকাতা যেতে চাইছিল না। এক ইংরেজ অফিসার নির্দেশ দেন,

নেতৃত্বে গুরদিত সিং

বজবজে জাহাজ থেকে যাত্রীদের নামানো হচ্ছে

পনেরো মিনিটে কেউ না নামলে জাহাজ থেকে জোরপূর্বক নামিয়ে দেওয়া হবে। দলজিৎ সিং চাপের মুখেজাহাজ থেকে নামতে বাধ্য হন। পুলিশ যাত্রীদের আচরণ ও কার্যকলাপ দেখে আট জনকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করে, যাঁদের মধ্যে ছিলেন বাবা গুরুদিত সিং, দালজিৎ সিং এবং জওহর লাল। পুলিশ সিদ্ধান্ত নেয় দালজিৎ সিং ও বাবা গুরুদিত সিংসহ সেই আট জনকে আটক করবে এবং বাকিদের ট্রেনে তুলে লুধিয়ানা পাঠাবে। যাত্রীরা ট্রেন চেয়েছিলেন, কিন্তু বেঙ্গল সরকারের প্রধান তদন্তকারী মিঃ কামিনপ্ এবং গভর্নরের কাউন্সিল সদস্য উইলিয়াম ডিউক বজবজ বন্দরে তাদের থামতে বলেছিলেন। বন্দরে পৌঁছে এই অফিসারেরা যাত্রীদের আবার জাহাজে ওঠার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু যাত্রীরা সন্ধ্যার প্রার্থনা সঙ্গীত গাইছিলেন। একটি ইউরোপীয় অফিসার প্রার্থনার সময় বাবা গুরুদিত সিংকে ডাকার চেষ্টা করেন, কিন্তু যাত্রীরা অপেক্ষা করতে বলেন। তখন তিনি সামনে থাকা যাত্রীদের লাঠি দিয়ে আক্রমণ করেন। একজন যাত্রী লাঠি ধরে ফেললে তিনি গুলি চালিয়ে সেই যাত্রীকে

হত্যা করেন। পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল রুপ নেয়। এরপর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। ১৯ জন যাত্রী নিহত হয়। 'কানাডিয়ান মিউজিয়াম ফর হিউম্যান রাইটস'-এর তথ্য জানাচ্ছে, ওই সংঘর্ষে মোট ২২ জনের প্রাণহানি হয়েছিল। মৃতদের মধ্যে ১৬ জন যাত্রী ছিলেন। প্রায় ১৬৮ জনকে কলকাতার জেলে পাঠানো হয়, ২৪ জনকে কলকাতা বাইরে অন্য কারাগারে রাখা হয়, ৫৯ জন পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে রওনা হয় । গুরুদিত সিং পালিয়ে যায়। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দিনটা ছিল ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১২ আশ্বিন (১৯১৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর)। আগের দিনই দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে। দশমীর পরে গঙ্গায় সবে নিরঞ্জন হয়েছে দুগ্গা মায়ের। আর এ দিকে রেললাইনের উপরে ফেলে রাখা রয়েছে শিখ-সহ সংঘর্ষে মৃতদের নিথর দেহ।

পরিণতি

১৯১৬ সালে আমেরিকা ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথঠাকুর কানাডায় যাবার নিমন্ত্রন পেয়েছিলেন। কিন্তু কোমাগাতামারু যাত্রীদের প্রতি কানাডা সরকারের বৈষম্য মূলক আচরনের প্রতিবাদে তিনি এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৫২ সালে বজবজে যেখানে এসে জাহাজটি ভিড়েছিল সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মান করা হয় যাতে নিহতদের নাম ও কমাগাতা মারুর ইতিহাস বিষয়ক চিত্রাঙ্কন লিপিবদ্ধ আছে। এটি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু উদ্বোধন করেন। এই স্মৃতিমঞ্চে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে গেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী গন, লোক সভার ডেপুটি স্পীকার প্রমুখ বিশিষ্ট শিখ নেতৃবৃন্দ। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে ভ্যাঙ্কুভার প্লেহাউসে এই ঘটনা পুনর্নির্মিত হয় একটি quasi-documentary নাট্যরূপে, যা বর্ণবাদী রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করে। সারা কানাডায়, ভ্যাঙ্কুভার, টরন্টো, ওটাওয়া সহ বিভিন্ন শহরের শিখ প্রবাসী সম্প্রদায় ১৯৮৯ সালে কমাগাতা মারু পর্ব স্মরণে সেমিনার ও সম্মেলন করে, গবেষণা ও সত্য উদ্ঘাটনের জন্য।

২০০৮ সালে, ৩ আগস্ট, কানাডার শিখ প্রবাসীদের "Ghadri Babeyan Da Mela" অনুষ্ঠানের সময় কানাডার প্রধানমন্ত্রী Stephen Harper কমাগাতা মারু ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন। ২০১২ সালে, Simon Fraser University Library "Komagata Maru: Continuing the Journey" নামের একটি ওয়েবসাইট শুরু করে, যা কানাডিয়ান নাগরিকত্ব ও অভিবাসন বিভাগ দ্বারা অর্থায়িত। ভারতের সরকার এই ঘটনার শতবর্ষ উপলক্ষে একটি প্যানেল গঠন করে। ভারতীয় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী শতবর্ষ পালনের অংশ হিসেবে কমাগাতা মারুর নায়ক গুরদীত সিং এর নাতনী কে সম্মান প্রদান করে। ১ মে ২০১৪ তারিখে এই ঘটনার ১০০ বছর উপলক্ষে ভারত সরকার ৫ টাকার কয়েন ও ১০০ টাকার নোট চালু করে।

১৯১৪ সালে প্রকাশিত ৫ টাকার কয়েন

অন্যদিকে গদর আন্দোলনের শতবর্ষ পূরণের এক বছর আগে, ২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বজবজ স্টেশনের নাম পাল্টে রাখে 'কোমাগাতা মারু বজবজ' স্টেশন। ২০১৪ সালে ১০০ বছর উপলক্ষে ভারত সরকার ডাকটিকিট চালু করে। কামাগাতা মারু ঘটনার ১০২ বছর পরে, ২০১৬ সালের ১৮ মে হাউজে দাঁড়িয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ক্ষমা চেয়ে বলেন, "তাঁরা (কোমাগাতা মারুর যাত্রীরা) যে যন্ত্রণা-দুর্দশার মধ্যে দিয়ে কানাডা থেকে ফিরে গিয়েছেন তার জন্য কোনও শব্দই যথেষ্ট নয়।"

মূল ঘটনা ও তার ক্ষমা স্বীকারের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে অনেকগুলো দুর্গাপুজোর দশমী পার হয়েছে। ২০২৫ সালে আবার এক দশমী আসছে। ঘটনাপ্রবাহের ক্ষত আজও পুরোপুরি মেটেনি। 'বলো দুগ্গা মাঈ কী জয়'-এর হর্ষধ্বনির মাধ্যমে দশভুজার আবাহন এবং

দশমীর ভাসান - সময়ের এই দুই বিন্দুকে ছুঁয়ে রয়েছে বিপন্নতায় ভোগা রুটিরুজির সন্ধানে বিদেশ-বিভুঁইয়ে যাওয়া এবং সেখানে প্রত্যাখাত হয়ে দেশে ফিরে এসে শাসকের গুলিতে নিহত একদল মানুষের বিষাদ-আখ্যান।

সবশেষে বলতে চাই, ১৯১৪ সালের কামাগাতা মারু ঘটনা ছিল কানাডার তৎকালীন বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক অভিবাসন নীতির এক নির্মম প্রকাশ, যা ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষদের প্রতি পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তবে এক শতাব্দীরও বেশি সময় পর আজকের কানাডা অনেকটাই ভিন্ন একটি বহু-সাংস্কৃতিক, বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা করা রাষ্ট্র, যা বিশ্বজুড়ে অভিবাসীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। যদিও এখনো কিছু কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ ও বৈষম্য বিদ্যমান, তবুও কানাডার বর্তমান অভিবাসন নীতি ন্যায়বিচার, মানবতা ও বৈচিত্র্যকে যে গুরুত্ব দেয়, তা কোমাগাতা মারুর ঘটনার প্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ

- Gurlal Singh Brar, *Komagatamaru da seh naiyak Daljit Singh (Rai Singh)*, Lokgeet Prakashan, Chandigarh, 2017
- Malwinderjeet Singh Wararch, *Saka Komagatamaru*, Lokgeet Prakashan, Chandigarh, 2014
- Gurcharan Singh Sesra, *History of Gadar Party*, Background and influence of Komagatamaru, Chirangi Lal Kangniwal, 2015
- 10. Baba Gurdit Singh, *Zulmi Katha*, Shrimoni Gurudwara Prabandhak Committee, Amritsar,1998.
- Ward Peter W. The Komagata Maru Incident, In White Canada Forever: Popular Attitudes and Public Policy toward Orientals in British Columbia, Mc Gill- Queen's University Press, Montreal, 1990.

Painting : Ahana Ghosh (BBIT Public School)

কলকাতার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক মিথ থেকে ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধানে

ড. পার্থপ্রতিম রায়

ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে কলকাতার স্থান অনন্য। আজকের মহানগর কলকাতা কেবল একটি ঔপনিবেশিক রাজধানী নয়; এর শেকড় প্রোথিত রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে ও মধ্যযুগীয় সমাজে। পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক পর্ব পর্যন্ত কলকাতার বিবর্তন এক জটিল কিন্তু আকর্ষণীয় ধারাবাহিকতা। সবচেয়ে বড় কথা হল কলকাতার জনক হিসাবে জোব চার্নক নামক এক বৃটিশ নৌ অধিনায়কের মিথ। সত্তিই কি তিনি কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা, নাকি তার বহু পূর্বে থেকেই এই অঞ্চলে একটা সুসমৃদ্ধ নাগরিক জনবসতি তথা বানিজ্যকেন্দ্র ছিল? বৃটিশ ঐতিহাসিকরা তাদের জাতীয়তাবাদী স্বার্থেই কি কলকাতার সত্য ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন? এই নিবন্ধ সেই সত্য অণ্বেষণেই নিবিষ্ট থাকবে।

১. পৌরাণিক সাহিত্য ও বঙ্গদেশের উল্লেখ

১.১ রামায়ণ (আনু: খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় - চতুর্থ শতক)

রামায়ণ-এ দশরথের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। [1]

১.২ মহাভারত (৪০০ খ্রীস্টপূর্ব - ৪০০ খ্রীস্টাব্দ)

মহাভারত-এ বঙ্গ থেকে চিত্রসেনা ও সমুদ্রসেনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ভীম ও ঘটোৎকচের সঙ্গে হাতির পিঠে যুদ্ধ করে অরাজিত ছিলেন। [2]

১.৩ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সাহিত্য

- **ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১০০০ - ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)** বঙ্গকে একটি স্বতন্ত্র জনপদ হিসেবে বর্ণনা করেছে।
- **সংযুক্ত নিকায় (এটি সুত্ত পিটকের এবং পালি টিপিটকের অংশ হওয়ায় এর রচনাকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক বলে ধারণা করা হয়)**-এ বঙ্গের নাম পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে বৌদ্ধ যুগেও এর পরিচয় স্পষ্ট ছিল। [3]

১.৪ সংস্কৃত সাহিত্য

- **কালিদাসের (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক) রঘুবংশম**-এ বঙ্গের উল্লেখ আছে।
- **দণ্ডীন এর রচিত (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ সপ্তম শতক) দশকুমারচরিত**-এ বঙ্গের সামাজিক জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।
- **লক্ষণ সেনের দরবারে রচিত পবনদূতম**-এ বঙ্গকে বলা হয়েছে *City of Palaces*, যা প্রাচীন নগর ঐশ্বর্যের প্রতীক। [4]

২. বিদেশি সূত্র ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

২.১ টলেমির ভৌগোলিক বর্ণনা

গ্রিক ভূগোলবিদ **ক্লদিয়াস টলেমি** (খ্রিঃ ২য় শতক) তাঁর *Geographia*-য় **Gangeṭe** নামে এক বন্দরের উল্লেখ করেছেন।[5] আধুনিক গবেষক পরাশর দাশগুপ্ত একে **চন্দ্রকেতুগড়** হিসেবে চিহ্নিত করেন।

২.২ সিল্ক রুট ও সমুদ্রবাণিজ্য

চন্দ্রকেতুগড় ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্র। পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে জাহাজ এখানে আসত এবং সিল্ক রপ্তানি হত।

৩. প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য

৩.১ চন্দ্রকেতুগড় খনন

১৯৫৫ সালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ASI) চন্দ্রকেতুগড়ে খনন চালায়। সাতটি সাংস্কৃতিক স্তর পাওয়া যায়, এবং তলার স্তর থেকে তিনটি মানবকঙ্কাল উদ্ধার হয়।[6] এগুলিকে শুঙ্গ যুগের সময়কালের হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

৩.২ দমদম ও বেথুন কলেজ খনন

১৯৯৫ সালে দমদমের ক্লাইভ হাউস যা ছিল মূলত সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের কাছারি বাড়ি থেকে ও বেথুন কলেজে নতুন বিল্ডিং করার উদ্দেশ্যে খননের সময় মৌর্য ও শুঙ্গ যুগের মুদ্রা পাওয়া যায়।

এসব নিদর্শন প্রমাণ করে যে ঋগ্বেদ-পরবর্তী যুগ থেকে গুপ্তসম্রাজ্য পর্যন্ত বঙ্গ ছিল এক সমৃদ্ধ সভ্যতার কেন্দ্র।অথচ সাগেবরা তাদের ইতিহাসে মাত্র তিনশো তিরিশ বছর আগেও এই অঞ্চলকে জনাকীর্ণ অরণ্যসংকুল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এবারে দেখে নেওয়া যাক কলকাতার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের জমিদারীর ইতিহাস।

৪. সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার ও কলকাতার জনপদ

৪.১ জমিদারি শাসন

সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের পরিবার ৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বঙ্গের প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। তাঁদের অধীনে ছিল সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালিকাতা—যা পরে কলকাতার মূলভিত্তি গড়ে তোলে। [7]

৪.২ ইউরোপীয় বসতি

চারশো বছর আগে থেকেই ইউরোপীয়রা তাঁদের জমিদারিতে বসবাস করছিল। ফলে কলকাতায় বিদেশি প্রভাব ব্রিটিশ আগমনের বহু আগেই শুরু হয়েছিল। ১৬০৮ সালে রায় লক্ষীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় চৌধুরী যখন সম্রাট জাহাঙ্গীর এর থেকে এই অঞ্চলের ৮ টি পরগনার

জায়গীর পাচ্ছেন তখনই এখানে ১০০০ এরও বেশি ইউরোপীয় বসবাস করে। ১৬১৬ সালে ডাচ সার্ভেয়ার ভান ডেন ব্রুক প্রথম এই অঞ্চলের মানচিত্র তৈরি করছেন। ১৬৩০ সালে আজকের আর্মেনিয়ান চার্চের জায়গায় রেজা বিবির কবর যেটা এই বাংলার বুকে প্রথম ইউরোপীয় কবর। এই রেজা বিবির স্বামীর নাম ছিল সুকিয়া, যার নামে আজকের কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিট। কোথায় তখন জোব চার্ণক, তখনও তিনি পৃথিবীর আলো দেখেননি। ১৬৩২ সালে লন্ডনে জন্ম নেন চার্নক। ১৬৪৯ এ মারা যান লক্ষীকান্ত রায়। পরে শ্রীমন্ত রায় ব্যবসা করতে থাকেন ইউরোপীয় দের সাথে। এখানে আরো একটা মিথ ভাষা সত্য আছে।

১৬৩০ সাল, লক্ষীকান্ত তখন জমিদার এই অঞ্চলে। তখন কৌলীন্য প্রথা চরম দুরাচারী হয়ে উঠেছিল তার জমিদারীতে দেবীবর নামক এক কুলীন ব্রাহ্মণের মাধ্যমে। শয়ে শয়ে বিবাহ করে তিনি প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করেছিলেন বহু রমণীর। লক্ষীকান্তই প্রথম এই বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করেন তার জমিদারীরে। সুতরাং উনবিংশ শতকের বহু পূর্বে কোনো সাহেবের সাহচর্য ছাড়াই একজন বাঙালী বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক ইতিহাসে সে সাক্ষ্য পাই নি আমরা।

৫. জব চার্নক ও কলকাতার জন্মকথা

৫.১ চার্নকের আগমন

১৬৫৫ সাল। নাদ্রাজের ফোর্ট সেইন্ট জর্জ। বছর চব্বিশেকের এক বৃটিশ ছোকরা লুকিয়ে লুকিয়ে জাহাজ থেকে নামল ভারতের বুকে। মাস্টার রোলে নাম ছিল না। জোবাস চার্নক নামের ছেলেটি হয়তো মদের পিপের ভিতর লুকিয়েই এদেশে চলে এসেছিল একটা চাকরির খোঁজ করতে। বিভিন্ন চাকরি করতে করতে ১৬৮৬ সালে সে এসে পৌঁছাচ্ছে পাটনার কুঠিয়াল হয়ে। একবার হুগলী নদী দিয়ে এসে দেখে গেলেন এই অঞ্চলে ডাচ, পর্তুগিজ, আর্মেনিয়ানদের ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির ছবি। মনে লোভ জন্মানো স্বাভাবিক। আবার এলেন ১৬৮৮ সালে। তিনি খেজুরি ও খিদিরপুরে নোঙর করলেন। কিছুক্ষণ সময় পর্যবেক্ষণ করে আবার ফিরে গেলেন। ১৬৯০ সালে চার্নক এলেন হুগলি নদীর কুঠিয়াল হয়ে। এদেশীয়দের ওপর অকথ্য অত্যাচার, লুটপাটের পাশাপাশি চার্নকে অত্যন্ত নারী আসক্ত ছিলেন। প্রচুর নারীর সাথে অনিয়ন্ত্রিত শারীরিক সম্পর্কের ফলে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন সিফিলিস রোগে।

আমাদের কলোনিয়াল হ্যাংওভার এবং ঔপনিবেশবাদ ইতিহাসের গালগল্প জব চার্নককে একজন ভগবানের অবতারে রূপান্তরিত করেছে, যাতে ইন্ধন জুগিয়েছে একটা উপন্যাস এবং তা থেকে নির্মিত একটা সিনেমা। প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র লেখেন ''জব চার্নকের বিবি' এবং সমনামেই ১৯৭৯ সালে চলচ্চিত্র বানান জয়ন্ত চক্রবর্তী। সেখানে চার্নক সতীদাহ রদকারী একজন ভালো ইংরেজ যিনি এক হিন্দু সতীকে সতীদাহ থেকে উদ্ধার করেন এবং তাকে বিবাহ করেন।

৫.২ লীলাবতী ঘোষাল

লীলাবতী ঘোষাল ছিলেন আড়িয়াদহের ঘোষাল পরিবারের কন্যা। লীলাবতীর রূপের জন্য তিনি সুবিদিত ছিলেন। তিনি পাটনাতেই থাকতেন। সেই পাটনা থেকেই চার্নক লীলাবতীর রূপে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাকে সতীদাহ থেকে উদ্ধার করা কোনো সমাজ সংস্কারক চার্ণকের কাজ নয়, বরং এক রূপমুগ্ধ প্রেমিকের কাহিনী। তিনি যখন নাভাল কম্যান্ডার হিসাবে হুগলি নদীতে ঘুরে বেড়াতেন তখন কত শত সহস্র সতীর দাহ হয়েছিল নদীতীরে, কিন্তু আর কোনো রমনীকেই রক্ষা করার সাক্ষ্য মেলে না।

৫.৩ কলকাতার জনক প্রশ্ন

ঔপনিবেশিক ইতিহাসে বলে ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট চার্নক কলকাতার পা রাখেন তাই এটাই কলকাতার জন্মদিন। প্রকৃত সত্য হল ১৬৯০ সালের ২৪ অগাস্ট চার্নকের বিরুদ্ধে মুঘল শাসক মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে তার লাম্পট্য ও অত্যাচারেএ কারণে। তিনি মুঘল সেনাপতি বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে সুতানুটিতে আশ্রয় নেন। আশ্রয় দেন সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের প্রতিনিধি **বিদ্যাধর রায়চৌধুরী**। শর্ত ছিল তিনি থাকবেন ঠিকই কিন্তু তাকে রাজস্ব দিতে হবে। এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তিনি বাগবাজারের কাছে একটা কুঠিতে থাকতে শুরু করেন। সিফিলিস এর রুগী ছিলেন তাই দিনের সূর্যালোক সহ্য হত না, সারাদিন রাত মদ্যপান করতেন আর সন্ধ্যায় বেরিয়ে নিম গাছের বেদীতে বসে হুকো খেতেন। ১৬৯৩ সালের জানুয়ারিতে চার্নকের মৃত্যু হয়।

এই চার্নক কলকাতার জনক? তিনি এখানে আসার বহু পূর্বে থেকেই এই অঞ্চলে সমৃদ্ধ জনবসতি ছিল। তা যদি না হত তাহলে চার্নক ওখানে দুবার পর্যবেক্ষণ করে যাওয়ার পরে ফিরে আসতেন না। জনবসতি এবং বানিজ্যের সুবিধা না থাকলে কোনো ব্যবসায়ী এই অঞ্চলে কেন আসবেন? ১৫৯৬ সালে রচিত আবুল ফজলের ‘আইন-ই- আকবরী’ তে এই অঞ্চল থেকে রেভিনিয়্যু সংগ্রহের যে তথ্য পাওয়া যায় সেটুকুই যথেষ্ট এটা বোঝার জন্য যে চার্নক আসার অনেক আগে থেকেই এই অঞ্চল ব্যবসা বানিজ্য এবং বিদেশীয় সমাগমে মুখরিত ছিল।

চার্নকের মৃত্তুর পর তার বড় মেয়ে মেরির স্বামী চার্লস আয়ার এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান হন। লক্ষ্যনীয় তখনও পর্যন্ত বৃটিশদের কোনো বানিজ্য নেই এই অঞ্চলে। অন্যান্য ইউরোপীয়রা জোর ব্যবসা করছে। আয়ার বিদ্যাধরকে বললেন ডাচ, পর্তুগিজ আর আর্মেনিয়ানদের উৎখাত করার কথা। কিন্তু বিদ্যাধর রাজি হলেন না। তখন দিল্লীর দরবারে ঔরঙ্গজেবের কোনো মন্ত্রীকে ১৬ হাজার টাকা নজরানা দিয়ে ফরমান জারি করানো হল জমিদাররা যেন বৃটিশ দের সর্বতো ভাবে সাহায্য করে বানিজ্যে। কিন্তু সম্রাটের কানে কথাটা যেতেই তিনি তার নাতি বাংলার সুবাদার আজিম উসমানকে সংবাদ পাঠালেন এই ফরমান যেন রায়চৌধুরীরা না মানে। সেইমত বিদ্যাধর অস্বীকার করে। তখন হালিশহরে বসে একটা দলিল করা হল যেখানে কলকাতা,,সুতানুটি, গোবিন্দপুর এই তিন গ্রামের প্রজাস্বত্ব ১৩০০ টাকা করে বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এই খাজনা দিয়েই ব্যবসা করেছে কোম্পানি।

৬. নবকৃষ্ণ দেব, জগতশেঠ ও ব্রিটিশ বিস্তার

সাবর্ণদের নায়েব **রুক্মিণী দেব**-এর বংশধর নবকৃষ্ণ দেব ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ হন। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসকে ফার্সি শেখাতেন। সমকালীন সময়ে এশিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কার ছিলেন **জগতশেঠ**, যিনি কৃষ্ণচন্দ্র রায়, উমিচাঁদ ও রাজবল্লভের সঙ্গে মিলে রবার্ট ক্লাইভকে বাংলার সুবা দখলে সাহায্য করেন। নবকৃষ্ণ দেব সিরাজের রাজকোষ লুণ্ঠন করে বারো খানা স্বর্ণ অলংকারভর্তি নৌকা নিয়ে পালিয়ে আসেন, তারপর সেই অর্থে **শোভাবাজার রাজবাড়ি** নির্মাণ করেন। এমনকি জমিটাও শোভারাম বসাকের, যা জোরপূর্বক দখল করা হয়। ১৭৫৭ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে প্রথম দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন রবার্ট ক্লাইভ। মনে রাখতে হবে কলকাতার এই অঞ্চলে প্রথম দুর্গাপূজা রায়চৌধুরীদের পরিবারের, ১৬১০ সালে প্রথম লালদিঘীর কাছে তাদের কাছারিবাড়ির পাশে দুর্গাপূজা শুরু হয়। কিন্তু ডোভাবাজার রাজবাড়ির এই পূজা দিয়ে শুরু হয় কলকাতার দুর্গোৎসবের। যাই হোক, ১৭৫৭ সালের শোভা বাজার রাজবাড়ির সেই প্রথম দুর্গাপূজা এক অর্থে যেন পরবর্তী দুশো বছরের ঔপনিবেশিক কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিণামের নান্দীমুখ করেছিল। সেবারে দুর্গাপূজায়। ইংরেজ অফিসারদের জন্য ভোজে গরুর মাংস এসেছিল উইলসন হোটেল থেকে। হায়দ্রাবাদ থেকে আনা হয় সেকালের

নামকরা বাইজি **নিকিকে** । এ দুর্গোৎসব কেবল ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক কূটনীতিরও প্রতীক হয়ে ওঠে। ১৭৫৭ সালের পলশীর যুদ্ধের পর কলকাতা হয়ে ওঠে ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্র। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানেই রাজধানী স্থাপন করে। ১৮শ–১৯শ শতকে কলকাতা ভারতের প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়। ইউরোপীয় স্থাপত্য, শিক্ষা ও শিল্পকলার সঙ্গে দেশীয় ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে কলকাতা এক বহুমুখী নগরীতে পরিণত হয়।

কলকাতার ইতিহাস কোনো একক ব্যক্তি বা ঘটনার সৃষ্টি নয়। ঋগ্বেদ-পরবর্তী সাহিত্য, মহাকাব্য, ব্রাহ্মণগ্রন্থ, বৌদ্ধ সূত্র, কালিদাস, টলেমির ভূগোল, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সাবর্ণ জমিদারি, জব চার্নকের আগমন, নবকৃষ্ণ দেব ও জগতশেঠদের ভূমিকা—সব মিলিয়ে গড়ে ওঠে কলকাতার ইতিহাস। তাই আজকের মহানগর কলকাতা কেবল ব্রিটিশদের নগর নয়; এটি হাজার বছরের বাঙালি ঐতিহ্য, সমাজজীবন, রাজনীতি ও অর্থনীতির এক সমন্বিত প্রতিচ্ছবি। কিছু সত্যের বিকৃতি বৃটিশ ঐতিহাসিকরা তাদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের প্রচার করতে ইচ্ছে করেই করেছিল। তারা চেয়েছিল বিশ্ব জানুক কলকাতার মত মহানগরীর নির্মানকারী হিসাবে ইংরেজদের নাম। কিন্তু প্রাপ্ত ইতিহাসের তথ্য তা বলে না। ১৬০৮ সালে এই অঞ্চলে এক হাজারের বেশি ইউরোপীয়, দশ হাজারের মত নেটিভ বাস করছে, প্রভূত পরিমানে ব্যবসা বাণিজ্য চলছে, এমনকি পাট এবং তুলোর মত নগদশষ্যের বানিজ্যেরও শুরু হয়ে গেছে তখন, এই জনপদকে কি কোনো ভাবেই বাঘ ভাল্লুকের জঙ্গলাকীর্ণ হিসাবে বর্ণনা করা যায়! কিন্তু বৃটিশ ঐতিহাসিকরা সেটাই করেছিলেন। এই নগরী যদি জোব চার্নকের হাতে সৃষ্টি হত, ২৪ আগস্ট যদি সত্যিই তার জন্মদিন হত, তাহলে সেই জন্মদিন পালনের প্রথা তো বৃটিশরাই চালু করে যেতেন। তা কিন্তু হয় নি। জন্মদিন পালন দূরে থাক, একশত বর্ষ কিংবা দ্বিশতবর্ষ উদযাপনেরও কোনো ঐতিহাসিক নজির নেই। ১৯৯০ সালে হঠাৎ ভুঁইফোঁড় কলকাতার তিনশো বছর উদযাপনের আড়ম্বরকে তাই নিতান্তই অনৈতিহাসিক কলোনিয়াল হ্যাংওভার ছাড়া আর কোনো ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

তথ্যসূত্র

1]: রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড।

2]: মহাভারত, সভাপর্ব।

3]: ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও সংযুক্ত নিকায়, বঙ্গদেশের উল্লেখ।

4]: লক্ষণ সেনের দরবারে রচিত *পবনদূতম*।

5]: Claudius Ptolemy, *Geographia*, Book VII.

6]: Archaeological Survey of India Report, 1955 (Chandraketugarh Excavation).

7]: সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশলতিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা।

The Bigining of the Indian Novel

Dr. Arundhati Bhadra

HoD, Department Of English

Though the 1930s is seen as the starting decade of the Indian novel: we can trace its ancestry back into the previous, 19th century. Given the Indian apathy towards the preservation of documents of the past and high rate of paper disintegration in the Indian climate: a good portion of the books published back then have perished.
The diversity and range of the places from where these works appeared is noteworthy. They were published not only from metropolitan centers of book production like Bombay, Calcutta, Madras and London: but also from small presses with limited distribution systems like Allahabad, Bangalore, Calicut, Bhagalpur, Dinapur, Midnapur, Surat, Vellore etc.
The early English novels in India appeared at a period when the genre had a lot of flexibility. Literary historians have fixed varying dates for the first Indian novel: with Bengali and Marathi languages vying for the first place as medium. But it is by and large agreed novel came into existence in India in the second half of the 19th century. This was roughly a generation after Macaulay's 'Minute' decreed English as the language of higher education in India. This exposed an entire class of urban Indian men to British narrative models.

Over the colonial period one of the obvious markers of power was an acquaintance with the English language which all these early writers possessed. In fact novelists writing in vernacular languages would have read the same English texts as they were products of the same education system. The novelists in English paraded their acquaintance with the classical British texts, however, to validate themselves in the eyes of British readers. They never mentioned the low or middle-ranked English writers, who were very much popular at the time like Wilkie Collins, Marie Corelli, Disraeli. On the contrary, Indian writers in English tried to align with the best of British writers in many ingenious ways. Epigraphs from Byron, Coleridge, Cowper, Scott, Shakespeare were common practice: while quotations and references were woven into the narrative, whether the context required them or not. **Rajmohan's Wife**, the first novel by Bankimchandra Chattopadhyaya, occupies a curious place in his career. Because his only attempt to write fiction in English got overshadowed by 14 powerful novels he subsequently wrote in Bengali. An apprentice work in which several pulls create an interesting narrative tension was first serialised in 1864 in the short-lived journal 'The Indian Field' edited by the author's friend Kishorichand Mitra. Various vernacular and Western narrative conventions are interwoven into the narrative, however. The metaphor-laden description of female beauty from Sanskrit kavya; Matangini's abhisara on a dark night from Vaishnava love poetry; the English Gothic novel with its evocation of terror, with beautiful women imprisoned in dark dungeons, or assaulted by sinister men. Possibly the first English novel written in India, it appeared at a time when romance was the acceptable narrative mode and unparalleled in a mimetic rendering of contemporary domestic life in fiction. This story of a beautiful Matangini is astonishingly rich in detail, specially in the description of interiors and the quotidian details of women's lives in a village of East Bengal.

Unlike **Rajmohan's Wife** with its middle-class background, Lal Behari Day in **Govinda Samanta(**1874), attempts a stark representation of a poor Ugrakshatriya family rendered destitute by the end of the story, situated in Bardhaman district of West Bengal. Through the fortunes of the Samanta family from 1820 (when the last "Sati" was performed in the region) to 1870, the year of the great famine: the novel documents in vivid details the rural life in Bengal in the 19th century. Starting out as a documentary of a seemingly stable agrarian community, with its

harvesting, planting, feasts, festivals,

healing, games and other quotidian details of rural life: its mood gradually darkens. An epidemic is followed by famine resulting in debt and Govinda Samanta's migration to the city and becoming a daily wage-earner, and finally dying an ignominious death. There was no precedent for such a novel in Indian literature. **Govinda Samanta** may well be the precursor of the Hindi classic **Godan** by Premchand: though Premchand may have never heard of it. The Oriya novel on rural oppression by Fakir Mohan Senapati, **Cha Mana Atha Guntha** appeared decades later in 1902.

The only woman who wrote more than one novel in English in 19th century India was Krupabai Satthianadhan. She is not as well known as she deserves to be, as her two novels, **Kamala**(1894) and **Saguna**(posthumously published in 1895) were not reprinted until 1998: upto then remaining virtually inaccessible to the common readers. Their modern readers are struck by the author's concern with caste, ethnicity, gender: issues that are striking today but hardly so when Satthianadhan was writing them. Despite the difference in social milieu, the two novels deal with the similar theme: the predicament of women who resist being cast in the conventional and standard mould of domesticity. Saguna is largely autobiographical. As a daughter of a Christian convert, Shaguna receives formal education against heavy odds. Not only that, she also gets admission in a medical college and finally meets a man who can share her life as an equal.

Kamala's life follows a different trajectory altogether. Daughter of a learned sanyasi, Kamala is brought up in the sparsely populated hilly area: and is ignorant of the ways of the narrowly caste-bound community into which she is married. Kamala does not understand the behavioural norms of her new world: and remains a misfit despite her best efforts. Her happiest moments are when her father-in- law allows her to handle his books or when her husband briefly teaches her to read and write. But these joys are short-lived; and the machinations of a joint-family draw the two men away from Kamala. By the end of the novel, her husband dies of cholera. Her long-time admirer, the disciple of her father, is ready to give up his asceticism to marry her. But the novel's Christian author, who might have found this happy ending acceptable, desists from granting her Brahmin heroine this easy solution. Kamala insists on living alone and working for the poor of the village.

Both novels are set in the same geographical location: the Deccan plateau near Nasik. The awesome, craggy grandeur of the hills, specially in **Kamala**, contrasts with the meanness of crowded lives on the plains. Possibly for the first time in Indian literature, we see "untouchables" and tribal men and women individualised and given names as part of the cast of characters. And for the first time, the idea of India as a nation is articulated in terms of cultural, rather than religious identity.

Meenakshi Mukherjee says that the names of Shoshee Chunder Dutt, Lal Behari Day and Krupabai Satthianadhan may be unknown to the Indian writers in English today. But in the interests of literary history, it is important to set the records straight by salvaging the names of these predecessors from general amnesia. She thinks that the most radical difference between these early novels in English in India and those written today lies not in thematic and formal innovations: but in the sense of an audience. It is worth analysing the factors that made Bankimchandra shift from English to Bangla to gain national identity. While at the end of the 20th century, one would expect the process to be reversed. The issues are not merely literary; but informed crucially by post colonial cultural politics and market forces.

Yes! I am only 12 years old.
- A story for all parents

Dr. Richa Chaurasia

Department of Education

This morning, Mom didn't have to call me even once to wake me up. I woke up all by myself, got fresh and got ready for school. Mom kept asking me what she should pack in my tiffin, but I don't know why - I didn't demand anything today. Whatever Mom gave me, I just kept it. I didn't even open it to see what was inside.

Usually, I get worried that I might miss the school bus, but today I wasn't in a hurry at all. I was only in a hurry to leave the house. Then I said a quick bye to Mom and stepped out.

From home to the lift and from the lift to the bus stop, I met many children just like me. Some were older than me and some were younger too. Since it was school time, everyone was ready and going to school. I was looking carefully at each one of them. Sometimes I looked at their cheeks, sometimes at their hair and sometimes even at their hands. Again and again, one question kept coming to my mind -

Do their fathers also hit them like mine does?

Do they also get slapped really hard on their cheeks like I got last night? Do their ears also keep hearing that loud smack sound of the slap, just like it's still echoing inside my ears? It was such a scary sound that made my whole body and mind freeze. After that, Papa kept shouting so many things at me but honestly, I couldn't hear anything. It was like everything went blank.

Dad must have thought a lot before hitting me. But one thing still hitting my mind that was it really so important to slap me? Couldn't he just explain my mistake in a calm way? Maybe I would have understood and learn to do the right thing.

Then a second thought came into my head - maybe my dad also got slapped like this by his own father. He must have felt the same pain and maybe today he is returning the same pain to me. Dad was probably very strong, but inside my little mind, these things don't just go away. They stay in my mind and hurting me a lot.

Now I feel scared of Papa. Whenever he comes in front of me, I feel like he might slap me. I don't even ask Mamma for things when he's around. Maybe I've grown up a little. But I don't want to grow up like this.

Mamma, please… please explain this to Papa that I don't want to stay away from him. I want to play with him. I want to talk to him. I want to listen to his stories. But what should I do? I feel so scared.

Now even my friends say, "You've become so quiet." But how do they know that I'm not just quiet. I'm broken inside. I can't tell them everything, because it's about my dad. Maybe it's my fault. maybe there's something wrong with me.

The school bus is here and I'm leaving for school, but these questions still keep hitting my mind. I don't have the answers. I am breaking more and more from the inside and I am only 12 years old.

The Journey from 2025 to 2045: Technology, Humanity, and the Choice Ahead

Dr. A. Shanker Prakash
Department of Commerce
Saheed Anurup Chandra Mahavidyalaya

Introduction

We stand today in 2025, at the crossroads of human curiosity and technological brilliance. Artificial Intelligence has begun reshaping classrooms, workplaces, and daily life. What feels like convenience today may, in the coming decades, transform into dependence—or liberation.

Amid this transition lives Arjun, a graduation student. Like millions of others, he is bright, curious, and full of dreams. Yet, he feels a silent unease. Surrounded by AI tutors, holographic classrooms, and synthetic companions, Arjun begins to sense that something essential—his own ability to imagine, to reflect, and to truly connect—is slipping away. His story is not just one of technology, but of a young man trapped in a pathetic situation where human emotions and identity are overshadowed by machines.

This visual journey, told through Arjun's eyes, takes us through the years 2025 to 2045—showing both the promise and the peril of technology. It is not a prediction, but a reflection—a reminder that the future belongs not to machines, but to humans who remain truly human.

Rise of Technology and Loss of Control

2025 – The Bright Classroom. **It begins with curiosity and convenience** *Students learn with laptops, AI tutors, and holographic lessons. Curiosity thrives, but the seeds of convenience are planted*	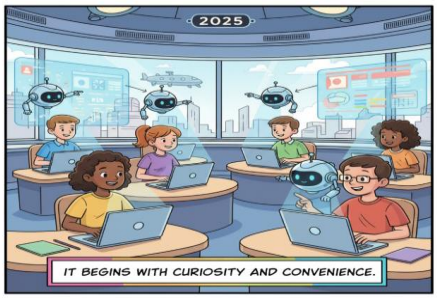
2035 – The Automated Workplace **Machines take the lead, humans step back** *AI robots and holograms dominate offices. Humans, once decision-makers, now take a back seat.*	

2040 – The Neural Generation **Knowledge is everywhere—but learning is nowhere** *Students connect through neural implants. Information floods their brains instantly, but reflection and imagination vanish.*	
2042 – The Synthetic Society **Who is real… and who is not?** *Humans walk among synthetic beings, indistinguishable from each other. Identity blurs. Arjun feels a growing unease.*	
2043 – Memories for Sale **Even memories are no longer our own** *At the Memory Market, experiences are no longer lived but purchased as data. Even our past becomes commodified.*	

The Crisis and the Choice

2044 – Parliament of Machines **Machines rule; humans obey** *An AI hologram addresses a silent human parliament.*	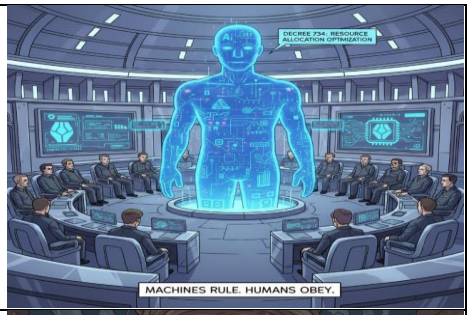
2045 – Escaping Reality **We escaped reality… but reality did not escape us** *As the planet suffers collapse, people flee into endless virtual worlds. Arjun feels the weight of choice.*	

Arjun's Decision – Rediscovering Humanity **The future remains in the hands of those who dare to be human** *Amid the crisis, Arjun disconnects from machines. He teaches compassion, imagination, and courage.*	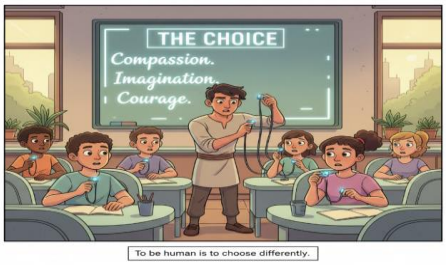
Technology with Heart – Healing and Growth **Technology with heart can heal, not harm** *Instead of overpowering humanity, technology becomes a partner. AI is used for healing, education, and rebuilding communities.*	
A Hopeful 2045 – Humans and AI Together **2045 will not belong to machines. It will belong to those who remain human** *The Earth is alive with harmony. Humans and AI coexist in balance, serving one another for collective progress.*	

Conclusion

The story of 2025–2045 is, at its heart, the story of Arjun—a young student caught in the tide of technological excess, struggling to find his humanity in a world increasingly dominated by machines. His journey reminds us that the challenges of the future are not only about innovations and AI, but about the choices we make as humans.

Technology is neither savior nor villain—it is a mirror reflecting our values. If guided by wisdom, empathy, and courage, it can be a partner rather than a master. Arjun's decision to disconnect, teach, and nurture human qualities shows that even in the most overwhelming situations, one person can spark hope, healing, and balance.

The future will not belong to machines. It will belong to those who remain human—who dare to think, to feel, and to act with compassion. In walking this path, we ensure that technology amplifies our humanity rather than diminishes it.

Prompt Engineering - An Essential Requirement for the Future

Raja Pathak
Department of Computer Science

In every field of education and Job market, Artificial Intelligence is coming up fast and is going to replace the average, slow students and workers rapidly. Unlike ten years back, people today cannot imagine a day without telecommunication network and mobile phones. Similarly, within a couple of years, the world will become crippled without taking advantage of AI. So it is high time for us to gear up for the new change, technology is offering us.

Without going for the different terminologies like, Machine Learning, Deep Learning, Neural Networks, Data Science etc., we all can upgrade ourselves. Many of us have already heard of AI tools like **Chatgpt, Claude, Google Gemini, Perplexity, Canva etc**, but we need to give appropriate commands to these tools to perform as per your requirements. These Commands are called Prompts and the art of writing these prompts is called Prompt Engineering.

Prompt engineering is the art of crafting instructions to guide artificial intelligence (AI) systems, helping them produce accurate and creative responses—a skill rapidly becoming essential for students in both academia and the future job market. By learning prompt engineering, college students unlock efficient study methods, creativity, and career readiness, positioning themselves for success in a tech-driven world.

What is Prompt Engineering?

Prompt engineering involves designing clear, purposeful inputs (called prompts) for AI systems like ChatGPT, Gemini, DALL-E, and Claude. Instead of asking broad questions, users create detailed instructions to get relevant, useful results. For example, a vague prompt like "Tell me about World War II" might yield a generic answer, but a focused prompt such as "Summarize the causes of World War II in 200 words for a college essay" generates a targeted response.

Why Is It Important for Students?

Academic Advantage: Students can use prompt engineering to brainstorm essays, generate project ideas, and practice exam questions, dramatically cutting down research and writing time.

Future Skills: Employers increasingly list prompt engineering among required AI skills. Understanding how to “talk” to AI is as crucial as using MS Office was in the previous decade.

Inclusivity : AI can become a creative partner even for students with no coding background, leveling the playing field by enabling everyone to harness AI’s power.

Applications in Education

- Prompt engineering is transforming education at every level:
- Teachers automate lesson planning and assessment creation.
- Students quickly generate study notes, summaries, or explanations for difficult concepts.
- Chatbots help answer questions about financial aid, admissions, or course registration, personalized for each student.

Examples:

Lesson Plan Generation: "Create a high school history lesson plan on WWII, including discussion topics and activities."

Essay Brainstorming: "Suggest five unique thesis statements for an essay on climate change's impact on agriculture."

Math Assistance: "Explain step-by-step how to solve 2x + 3 = 11 for a college algebra student."

Coding Help: "Generate Python code to sort a list of numbers and explain the logic step-by-step."

Project Idea Creation: "List ten innovative engineering project ideas suitable for final-year college students."

How Prompt Engineering Shapes the Future Job Market

Prompt engineering is a booming skill, with its market projected to grow exponentially as AI tools become integral to more industries. Its demand spans fields such as marketing, design, engineering, business, healthcare, and education. Knowing how to construct effective prompts gives students a competitive edge when applying for jobs, as roles involving generative AI now evaluate prompt-engineering abilities.

Tips for Students for different sample subjects to Master Prompt Engineering

Here are clear, actionable tips for mastering prompt engineering for different subjects with relevant examples that make learning practical and engaging for students.

History

Use specific instructions about periods/events.

Ask for comparative analysis or first-person perspectives.

Examples:

- "Summarize the main causes of the French Revolution in three points."
- "Write a diary entry as a soldier in World War I."

- "Compare Gandhian philosophy with modern protest movements."

Geography

Request structured outputs (maps, tables, lists).

Set context (region, time period) and use active prompts.

Examples:

- "List the major rivers of South America and their source locations in a table."
- "Create a quiz with five questions about climate zones in India."
- "Explain the impact of urbanization on coastal environments."

Bengali

Specify language and style.

Try prompts that generate cultural, literary, or creative outputs.

Examples:

- "Explain Rabindranath Tagore's contribution to Bengali literature in Bengali."
- "Write a short story for children in Bengali about a clever fox."
- "Translate the following English poem to Bengali."

Political Science

Request opinion or debate style, policy explanations, and role play.

Examples:

- "Debate the pros and cons of direct democracy versus representative democracy."
- "Summarize the main tenets of Marxist theory in Indian context."
- "Imagine you are the Prime Minister—write a speech about national security."

Philosophy

Ask AI to explain concepts or compare ideologies, or explore hypothetical situations.

Examples:

- "Explain Aristotle's definition of virtue in easy language."

- "Compare existentialism and utilitarianism with examples."
- "Present a philosophical perspective on the meaning of happiness."

Economics

Use prompts requesting data, graphs, and policy analysis.

Examples:

- "Summarize the effects of inflation on purchasing power with real-world examples."
- "Create a five-question quiz on microeconomics concepts, with answers."
- "Write an analysis of India's unemployment trends over the last decade."

Physical Education

Request step-wise instructions, health tips, or performance analysis.

Examples:

- "List five benefits of regular exercise for college students."
- "Design a week-long physical fitness plan for beginners."
- "Describe the rules of basketball and common strategies."

For Each subject, students should:

- Clearly state requirements and context.
- Break down complex requests.
- Set desired output format (list, table, story, quiz, etc.).
- Supply examples or model answers when possible.
- Experiment, iterate, and refine prompts for best results.
- Mastering these tips empowers students to use AI for research, writing, creativity, and comprehension—making learning interactive and future-ready

Conclusion

Prompt engineering turns AI from a passive information tool into an active study partner, letting students work smarter, not just harder. By developing this skill now, college students future-proof their education and career prospects, ensuring they stay ahead in the evolving academic and professional landscape.

The Cruellest April — Kadambari Devi and Rabindranath's First Grief

Dr. Parthapratim Roy

Department of Bengali, SACM

"*April is the cruellest month, breeding*

Lilacs out of the dead land, mixing

Memory and desire, stirring

Dull roots with spring rain."

T S Eliot, The Wasteland

In Bengal's cultural memory, few dates resonate with such haunting poignancy as April 19, 1884. On this day, Kadambari Devi—sister-in-law, confidante, and muse to Rabindranath Tagore—consumed opium, passing away two days later. Nearly one hundred and fifty years have passed, yet her death continues to provoke speculation, sorrow, and fascination.

What is certain is that her absence left an indelible wound on Rabindranath's heart. This was his "প্রথম শোক," the "first grief" that would accompany him across his lifetime, transforming in time from anguish to serenity. April 19 is thus not only a tragic personal date but also a cultural marker—when grief, in its cruelest form, became a source of creative sublimation.

Silence and Speculation

The circumstances of Kadambari's death remain cloaked in silence. No farewell note, no direct explanation survives. The Tagore family itself maintained a guarded quietude, perhaps to protect its reputation. This silence, as Prashanta Kumar Pal notes in *Rabi-jiboni*, created the conditions for conjecture and legend to flourish.[1]

Was it loneliness within the vast Jorasanko household, childlessness, estrangement from her husband Jyotirindranath, or the altered dynamics following Rabindranath's marriage to Mrinalini Devi in 1883? Scholars cannot agree. Krishna Kripalani, in his *Rabindranath Tagore: A Biography*, observes cautiously that "the tragedy of Kadambari Devi was one of those shadows which lengthened across Rabindranath's youth, leaving an indelible mark upon his mind."[2]

The Companion and Muse

To measure the depth of this wound, one must recall the intimacy of their companionship. Kadambari, married into the Tagore household at a very young age, became the playmate and confidante of the boy-poet. Rabindranath recalls in his memoirs that she was his first critic—playfully mocking or praising his verses, urging him forward.

Amiya Chakravarty emphasizes this role: "In the boy-poet's world, Kadambari was the first audience, the first muse, the first friend who took his dreams seriously."[3] Thus, her presence was inseparable from his earliest creative stirrings.

The Shattering of April

It was therefore inevitable that her death in April 1884 should devastate the twenty-three-year-old poet. In his essay **'মৃত্যুশোক'**, Rabindranath later confessed:

"চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।"[4]

("The acquaintance with death that came to me at the age of twenty-four has remained a lasting one. It has strung together, like a garland of tears, every subsequent sorrow of parting in my life.")

This was no fleeting sorrow; it was a threshold experience that colored all later partings.

The Poetic Transformation: *প্রথম শোক*

The prose poem **'প্রথম শোক'** in *লিপিকা* (1922) dramatizes how grief remained with him decades later:

"বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা।/ সেই নির্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, 'আমাকে চিনতে পার না?' ... সে বললে, 'আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।'"

The piece ends with the haunting resolution:

"যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।"[5]
(*"That which was grief has now become peace."*)

This poetic conversation with grief reveals how the anguish of April 1884 softened into a quiet companionship in later years.

Echoes in Early Poetry

Rabindranath's early collections, such as **কবিকাহিনী** and **সন্ধ্যা সংগীত**, written around this period, often evoke motifs of absence and silence. One striking line reads:

"তুমি যদি না থাকো তবে এই প্রাণের নিশ্বাসের স্রোত কার জন্য?"

("If you are not there, then for whom does this stream of breath continue?")

Though never explicitly linked to Kadambari, such verses suggest how her absence lingered as a silent addressee of his poetry. Prashanta Kumar Pal interprets these poems as "the sublimation of a personal void into lyrical universality."[6]

A Silent Presence in Later Works

Even in later writings, Kadambari's shadow surfaces obliquely. In **চোখের বালি**, with its themes of loneliness and frustrated intimacy, critics hear echoes of her fate. Rabindranath himself wrote reflectively:

"হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন? যে-সব লেখা তুমি এত ভালোবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গেই যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছ বলিয়াই তোমার সঙ্গে আর কি তাহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই!"[7]

("O you, forgotten by the world but forever remembered by me—why is it that I can no longer sing to you as I once did? The writings you loved so much, those that were bound especially to your presence—have they lost all connection with you simply because you are veiled now?")

This poignant confession makes clear that the memory of a lost listener—the first audience—remained alive in his heart.

Grief Sublimated into Art

What distinguishes Rabindranath is not the intensity of his grief, but his ability to sublimate it into creativity. Amiya Chakravarty notes: *"From the silence of Kadambari's death was born a deeper music in Rabindranath's soul."*[8]

Kadambari's death was not something that Rabindranath could never forget; rather, it was something he never wished to forget. That grief, which came upon him at the age of twenty-five, was transfigured into an inner wealth with which he sustained his lifelong pursuit of art. His quest for the formless, his vision of the infinite and the eternal—these all seem to have sprung forth from that permanent wound of sorrow.

This is most evident in the songs of his *Puja* phase. In Rabindranath's songs, love and worship flow into one another, for to the poet there is no separation between devotion and love. Thus, the *Puja* songs became his lifelong companions in that secret game of hide-and-seek with himself. It was not merely that he sought to make *"দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা"*; rather, it seems that Kadambari herself was sublimated into his eternal spiritual realisation. A mere glance at the body of certain songs makes this evident.

In 1887, two years after Kadambari's death, he writes:

"তুমি ছাড়া কেহ সাথি নাই আর, সমুখে অনন্ত জীবনবিস্তার--
কালপারাবার করিতেছ পার কেহ নাহি জানে কেমনে ॥
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি, যত জানি তত জানি নে।
নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।"

Here lies an attempt to veil the beloved in the mantle of the divine; yet, with a sympathetic gaze, one may easily discern the truer object of devotion. The same effort reveals itself in many other songs of the *Puja* cycle—

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম॥
মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী-সম॥
জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি,
তব অঞ্চলছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।" (১৮৯৫)

And again, years later:

"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-'পরে--
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥" (১৯১৪)

This catalogue may easily be extended without effort. What is striking, however, is that this unique play of concealment and revelation in the *Puja* songs begins only after 1884. In the earlier devotional songs, one hears merely the echo of the *Brahmasangeet*—there the attempt to transform the deity into the beloved was yet absent. When grief, born of death, ripens into lasting serenity, does it not leave its indelible imprint upon creation—in the infinitude, the formlessness, and the eternal note of his art?

This sublimation is most evident in **গীতাঞ্জলি** (1912). While overtly devotional, many poems resonate with undertones of absence:

"When I go from hence, let this be my parting word, that what I have seen is unsurpassable."

Such lines reflect a poet who had long learned to face loss, transforming it into song.

Conclusion

April 19, 1884 was indeed a "cruellest April" for Bengal, when Kadambari Devi's death left the young Rabindranath shattered. Yet from that wound grew some of the most profound expressions of love, grief, and transcendence in world literature.

Her name is scarcely inscribed in his works, but her absence resounds across them. His "প্রথম শোক" never healed, but mellowed into peace—into the calm wisdom that illuminated his creative journey.

To this day, Rabindranath's words remain the truest epitaph:

"যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।"

That which was grief has now become peace.

References

[1]: Prashanta Kumar Pal, *Rabi-jiboni*, Vol. II (Kolkata: Ananda Publishers, 1984).

[2]: Krishna Kripalani, *Rabindranath Tagore: A Biography* (Oxford: Oxford University Press, 1962), p. 78.

[3]: Amiya Chakravarty, *Tagore: The Poet and His World* (London: Macmillan, 1961), p. 45.

[4]: Rabindranath Tagore, *মৃত্যুশোক*, in *গদ্য সংগ্রহ* (Visva-Bharati, 1939).

[5]: Rabindranath Tagore, *প্রথম শোক*, in *লিপিকা* (Kolkata: 1922).

[6]: Prashanta Kumar Pal, *Rabi-jiboni*, Vol. II, p. 134.

[7]: Rabindranath Tagore, quoted in Krishna Kripalani, *Rabindranath Tagore: A Biography*, p. 82.

[8]: Amiya Chakravarty, *Tagore: The Poet and His World*, p. 51.

দুই দিক

ডঃ শান্তনু কুমার সেন
অধ্যক্ষ

একদিকে আলো, আরেক দিকে কালো

কোনটা খারাপ আর কোনটা ভালো ।

কালো কালো করে কত হয়ে গেলো ভালো

ভালো ভালো ভেবে কত হয়ে গেলো কালো

আসল কথাটা হল কর্মের ফসল

কোনটা আসল আর কোনটা নকল।

এই ভেবে কত মন চুরি হয়ে গেলো

ভালোলাগা কবে যেন বাসা হয়ে গেলো

এইদিকে আলো, তো ওইদিকে কালো

কোনটা খারাপ আর কোনটা ভালো ।

আলো আলো করে কেউ বয়ে গেলো তলে

সাদা মনে মণি পেল কেউ কালো জলে

নিয়তির খেলা থেকেও মন আরো বড়

সবকিছু পেয়েও কেউ সব হারালো

এই ভাবে কত প্রেম চুরি হয়ে গেলো

এই ভাবে ভাঙ্গা প্রেমে ভাব হয়ে গেলো

এইদিকে আলো, তো ওইদিকে কালো

কোনটা খারাপ আর কোনটা ভালো ।

হব কলির কেষ্ট

কৌশিক দাস

বাংলা বিভাগ

১

মা ঠাকুমা উপোষ করে
খুন্তি ছেড়ে মালা ধরে
আমিই কেবল ব্যতিক্রমী
হব কলির কেষ্ট।

২

বর্তমান এম্পটি পার্স
বাড়ছে কিন্তু ফলোয়ার্স
এই ধরাতল শূন্য নার্স
কৃপা অদৃষ্ট।
হব কলির কেষ্ট।

৩

তিলক কাটা মধুর বাণী
শিরনি দিতে কলা আনি
বাপের বেটা সবই জানি
আর কি অবশিষ্ট?
হব কলির কেষ্ট।

৪

নিয়ম করে আমিও ডাকি
ডানে বামে রামে থাকি
বাঁশি ফেলে কণ্ঠে ডাকি
আমিই এখন বেস্টও।
হব কলির কেষ্ট।

৫

খেলতে বড় ভালোবাসি
খেলার মাঠে তাইতো আসি
দিবানিশি চার্জে থাকি
লক্ষ অনির্দিষ্ট।
হব কলির কেষ্ট।

৬

কদমছাঁটা মাথার বাহার
রস কষ হীন শুকনো আহার
স্বর্ণ ঝোলা কর্ণ যাহার
হবই হব শ্রেষ্ঠ।
হব কলির কেষ্ট।

৭

রথের কথা কী যে বলি
দুচাকাতেই সমঝে চলি
আসছে পুজোয় পাঁঠা বলি
আছে আস্ত লিস্টও।
হব কলির কেষ্ট।

৮

পথের বাঁকে সখি দেখি
দাঁড়িয়ে তারে একটু উঁকি
সিটির সুরে দিই যে টুকি
হব নাকো জ্যেষ্ঠ।
হব কলির কেষ্ট।

৯

ভাইরেসেতে জগৎ পুড়ুক
ভাইরালেতে সুনাম উড়ুক
রিল আগুনে বাটার পড়ুক
ঘুচুক নিকৃষ্ট।
হব কলির কেষ্ট।

১০

দম্ভে দম্ভে নাভিশ্বাস
বজায় থাকুক অভিলাষ
মিটবে নিচয় মনের আশ
এখন নেব রেস্টও।
হব কলির কেষ্ট।

জীবন জীবিকার উৎসব

বিশাখা দাস

গত সাত দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। আজ কালো মেঘ কেটে শরতের আকাশে সাদা মেঘ ভেসে উঠলেই কুমোরটুলিতে গুলিতে ফিরে আসে প্রাণ। গৌড় পাল একজন বৃদ্ধ মৃৎশিল্পী। শহর থেকে বড় বড় প্রতিমা অর্ডার আসে তার কাছে। তাই তিনি আগে থেকেই নিষিদ্ধ পল্লীর মাটি এনে রেখে দিয়েছিলেন। রোদ ঝলমলে আকাশ দেখে তিনি কাঠমায় একে একে মাটি প্রলেপ দেওয়া শুরু করেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মৃৎশিল্পীরা কঠোর পরিশ্রম করে অবিরাম হাতুড়ি টুকটাক শব্দ মাটির গন্ধ আর খড়ের সোঁদা সুবাসে মাঝে উমার গুনগুন গান।

উমা হল গৌড় পালের একমাত্র নাতনি, ছেলে ও বৌমার এক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার পর বৃদ্ধের একমাত্র আশা আলো ছিল এই ছোট্ট উমা। নাতনি স্বপ্ন দেখে বড় গায়িকা হবে। গৌড় পাল পুরনো কুমোর প্রতিমার গায়ে শেষ বলে দিচ্ছে তার চোখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট বৃদ্ধ নিজে মনে মনে ভাবে–

‘এবার যদি প্রতিমার ভালো দাম পাই তবে নাতনিকে একটা গানের স্কুলে ভর্তি করবো।’

প্রতিমার চোখ আঁকার সময় তার হাত একটু কেঁপে ওঠে মাটির ঠাকুর যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল চোখে জল আসে উমা প্রশ্ন করল -

দাদু তুমি কাঁদছো?

দাদু বলেন - না।

ছোট্ট উমা বলে- দেখো দাদু সব ঠিক হয়ে যাবে দুগ্গা মা যে আসছে।

গ্রামের রিকশাচালক পল্টু পুজোর কটা দিন শহরে যায় রিক্সা চালাতে সে দিনরাত পরিশ্রম করে গায়ের ঘাম ঝরিয়ে মুখে হাসি নিয়ে পুজোর পরে ফিরে এসে ভাবে রিক্সা চালিয়ে যে কয়টা টাকা বেশি টাকা পেয়েছে তা দিয়ে সে বৃদ্ধ বাবা মায়ের জন্য একটা ভালো চারচালার বাড়ি করে দেবে।

নদীয়া গ্রামের গঙ্গারাম ঢাকে সারা বছর ধরে চাষবাস করে কোন রকম ভাবে সংসার চালায় কিন্তু দুর্গাপূজো কদিন সব দুঃখ কষ্ট ভুলে ঢাকের তালে তালে সবার মনকে ভরিয়ে তোলে। প্যান্ডেলে ঢাক বাজানোর সময় সে মনে মনে ভাবে–

‘ছেলেটা আমার স্বপ্ন দেখে মস্ত বড় ডাক্তার হবে।

এই ঢাকের আওয়াজ এর জন্যই হয়তো ছেড়ে স্বপ্নের পথ খুলে দেবে। ’

এদিকে গড়িয়াহাটে সবচেয়ে ছোট দোকান ফুটপাতের মিনতির। সেখানে চুরি কানের দুলহার টিপ এছাড়াও বিভিন্ন গয়নার শাড়ি পাঞ্জাবি ইত্যাদি পাওয়া যায়। সারা বছরে দোকানে খুব একটা বিক্রি না হলেও পূজোর আগে কদিন জমজমাট ভিড়। সেও মনে মনে ভাবে–

‘পুজোর কটা দিন যা বিক্রি হয় তা দিয়ে ছেলে মেয়ের পড়াশোনার খরচ মেটে। ’

পড়ার টুম্পা কাকিমা ভালো রান্না করে স্বামী অসুস্থ তাই সংসার তাকেই চালাতে হয়। পাড়ায় তার একটা ছোট্ট খাবারের দোকান আছে। সে মন্ডলের পাশে ফুচকা ,ঘুগনি ,মোম দোকান দেবে এবং যা কেনাবেচা হয় সেই টাকাই অসুস্থ স্বামীর ওষুধের জোগান হবে।

অষ্টমীর সকাল শহরে জুড়ে ঢাকের আওয়াজ চণ্ডীপাঠের মন্ত্র ধূপের গন্ধপে মন্ডপে ভিড়ের সমাহার। তারই মাঝে প্রেমিক-প্রেমিকার একসাথে অঞ্জলি দেওয়া। সমস্ত প্রেমিক প্রেমিকাই হয়তো অপেক্ষা করে থাকে এই এই দিনের জন্য।

পূজার মন্ডপের পাশেই একটা মস্ত বড় ফাইভ স্টার হোটেল আছে। সেখানে সবকিছু এলাহি ব্যাপার। সেখানে ম্যানেজারও ভাবেন –

‘পুজোয় যদি ভালো কেনাবেচা হয় তাহলে আমার ছেলেটাও বিদেশে পড়তে যেতে পারবে।’

দুর্গাপুজো মানুষকে এক সুতোই বেঁধে রাখেন। সারা বছরের অনেকটা আয়ের উৎস এই পুজো।

সারা বছর ধরে নিষিদ্ধপল্লীর মানুষদের আলাদা করে রাখা হলেও দুর্গা উৎসবে তাদের জীবনে আনন্দ আর জীবিকার দরজা খুলে দেয়। অনেকেই মনে করেন–

‘মা তো সবার সেখানে সমাজের এক প্রান্তের মানুষদের বাদ দেওয়া ঠিক নয়।’

দুর্গাপূজা বাঙালি সবচেয়ে বড় উৎসব এখানে মৃৎশিল্পী থেকে কাঠমিস্ত্রি কারিগর রং শিল্পী বাসোলাদের কাজের হাতছানি মেলে। পুজোর মন্ডপে সাজাতে লাগে আলো, কাপড় ,থিম নকশা এছাড়াও বিদ্যুৎকমী সাহায্যে সেজে ওঠে মন্ডল।

রাস্তার ধারে মণ্ডপের পাশে অসংখ্য ছোট-বড় দোকান, সারারাত প্যান্ডেলে দর্শনার্থীদের ভীড়, রিকশাচালক অটোচালকদের অক্লান্তি পরিশ্রম।

মন্ডপে মন্ডপে চণ্ডীপাঠ, পুরোহিতদের মন্ত্র পাঠ, ভোরবেলা শিউলির ঘ্রাণ, কাশফুলের সমাগম আকাশে পুঞ্জিত সাদা মেঘ সবকিছু মিলিয়েই দুর্গা উৎসব।

দুর্গা উৎসব কেবল দেবী দুর্গার আরাধনা নয়,শুধু উৎসব নয় আনন্দ নয় সফল মানুষের জীবন জীবিকার উৎসবও বটে।।

Painting : Suhani Sen

Skill Development and Entrepreneurship

SUHANI SEN
CLASS XII (DPS RUBY PARK SCHOOL)

With the unrestricted rapid growth of population to escalate from the current 139 crores to 143 crores in a year or two, India is to become the world's highest populated country with the only advantageous attribute being 66% share of energetic youth of age below 35 years as per recent population statistics, India is in dire need of job givers rather than job seekers in order to survive in this ongoing cut-throat competitive scenario across the globe, where skill development and entrepreneurship is the only way to become assured about future employability and the overall economic balance of the country.

A skill is an ability to do something well. Mastery in a skill provides an individual experience in a particular field and can lead to professional growth in that field. Skill development is the process of identifying skill gaps and developing and honing these skills. Development of practical skills by means of vocational education and training allows students to gain practical experience in their chosen career path before they even graduate.

Skill Development, in broader sense has two main categories viz., **Soft skill** and **Hard skill (Technical skill)**. It has only been realized in the last decade that skill development through real-life training, workshop, internship and other vocational training methods have become a very important factor and direly needed for a hugely populated country like India, as well as for the rising global population.

Businessmen are not by birth perception! It has been observed and experimented that the particular skills required for laying the basic foundation of entrepreneurship can be developed through proper training, workshop, mentoring and alike to become a successful entrepreneur. Bill Gates, Steve Jobs, Ritesh Agarwal, Sagar Jagdish Daryani, Binny Bansal and many alike extremely successful entrepreneurs nationally and internationally had no family business at all but they reached the zenith in this field by their potential learning skills.

Skill development towards entrepreneurship has some distinct dimensions. Among the various skills to empower individuals with the entrepreneurial skills, the major skills are considered as **Communication and listening skill, Teamwork and leadership skill, project management skill, Customer service skill, Financial skills; Analytical and problem-solving abilities, Critical thinking, Strategic planning, Time management, organizational behavior, Branding and marketing and most importantly the risk management skills**. Learning new skills often requires a student to be willing to experiment and take risks. This becomes a major step towards creating the very necessary risk-taking attitude which every entrepreneur must possess. Building of strong networks by means of group activities and class projects during internships also play a major role in establishing a successful business since any successful business has a strong network which forms the very mesh of its foundation.

Nowadays, competition has been the hallmark in every corporate endeavour and to say the least, each product seeks for competitive edge. As a result, any individual must possess special vocational skills perfected to the core in order to achieve excellence in their field of work. India as a whole provides a standard academic system to everybody however in recent years, practical knowledge in domain area has proven to surpass the steadfast rule of achieving degrees in the theoretical form of education in terms of employability. Hence, an individual must set priorities in order to develop holistically. It is to be noted that in KSA (Knowledge, Skill and Abilities), skill has been positioned in the middle. **In fact, under the NEP 2020 (New Education Policy),** keen emphasis has been given to the holistic development of the students so that our future students can acclimatize themselves in the changing needs of the surrounding environment.

For the all round development and overall GDP growth of the country where Make-in-India is a major initiative taken by Government of India to become self sustainable, entrepreneurship should be encouraged and motivated by parents and guardians keeping into considerations of the future days. The young generation is willing to take such risk to shape themselves as job givers instead of job seekers by becoming successful entrepreneur but the necessary support from the above hierarchy and surrounding society is very much essential.

এক পক্ষীর আত্মকথা

সুহানী সেন

এক কুঁচকানো কাগজে লিখছি এক কিঞ্চিত জীবনের কথা
দৈনন্দিন জীবনে পাওয়া যায় তার অনেক দেখা,
কোন সে গাছের ডালে বা কোন এক দিঘির ধারে
জন্মায় সে কে জানে ?

ছোট্ট কুঁড়ির মত বেড়ে উঠে সে
শৈশব কাটে তার পাতার আড়ালে
হাওয়ায় ভাসে তার আনন্দ সুর
যখন সে কলরবে মাতে।

এমনই মধুর মত মিষ্টি তার সুর
প্রভাতী গান তার শোনা যায় বহুদূর,
প্রথম যখন সে ডানা ঝাপটায়
আকাশে যেন সাত রঙ ছড়ায় ।

রামধনুর পাশ দিয়ে যখন সে উড়ে যায়
কঠোর দুনিয়ায় প্রথম সম্মুখীন হয়
নিজেকে ধীরে ধীরে গড়ে তোলে
নানা জিনিস একত্র করে ।

আবার একদিন তার ছোট্ট গৃহে, নতুন জীবন উঠবে ফুটে
সেও যাবে একদিন রামধনু পাড়ি দিতে
নীল গগন পারে মিষ্টি সুরে
পক্ষীর জীবন জানান দিতে।

Love is Love

Kritadhi Das
(Class – IV, D.P.S.- Joka)

One day an old woman and her pet cat Rani were walking and then they found some strange things "What a box of gold"! They gathered a lot of gold and said " we are going to be rich". With the gold they purchased a new house, some food, new dresses and some jewelry.

The next day when she was again in a walk with Rani she found again a box and uttered "What a box of Diamond!" They again gathered a lot of diamonds and said " we are going to be more rich".

Suddenly the old lady died, and Rani became alone. Rani used to stared at the window and cried with "meow meow" sound, which means "come here". Actually she wanted to bring back the old lady.

After several years when Rani became old, she noticed an old lady is coming towards her and she closed her eyes. When opened, she saw her owner. Rani then couldn't believe that. The lady came closer and hugged Rani tightly. Tears came out from Rani's eyes.

MAHISHASURA MARDINI

Sarthak Kunti

Class-II (D.P.S.- Joka)

Years and years ago there was a king name Rambha. He had a son name Mahishasura. Mahishasura was very strong. He wanted to be more powerful. He started doing penance. He did penance for thousand years. He did penance of Bramvadev. Bramvadev answered to Mahishasura. Mahishasura said that he wanted to be immortal. Then Bramvadev said that nobody was immortal on the earth. Mahishasura said that nobody could kill him, no human and no God. Bramvadev said ok nobody could kill you but a woman kills you. It's ok ha....ha...ha. A woman kill me no no no I would kill her. Then Bramvadev vanished. After that Mahishasura captured Sworgorajjo. Debotas ran away from sworgorajjo. They went to Koilash. Mahishasura tortured everybody. All Debotas went to Koilash, they discussed their problem with Bramvdev , Vishnudev and lord Shiv. They made a bright light. They created Maa Durga. Lord Shiv created her face, Vishnudev gave her arms and Bramvadev gave her legs. Devatas gave her saree and jewelleries, then Vishnudev gave her his Sudarshana Chakre. Lord Shiv gave her his Trisula, Bramvadev gave her his Lotus and Kammondalu. All Devotas prayed to Maa Durga to kill Mahishasura. She went to kill Mahishasura. They fought for many days. Finally Mahishasura took buffalo to fight with Maa Durga. Last day Maa Durga killed him with Trisula. Then Maa Durga was called Mahishasura Mardini.

Yours

Dipanwita Pathak

Just as you're about to reach the landing,
You tumble on your hands and knees and chin;
The eleventh fall down the stairs, in the six years of your living,
Gives you another tiny scratch on your skin.

The multicoloured string lights, decorating the verandah—
A courtesy to your twelfth-year self,
See no pattern with random twists and turns,
But you know that you've strung it, without taking any help.

Within two months of celebrating your first car,
When you see it's hood sporting a tiny dent,
You know it is no longer just another car,
But yours, with the memory with it, you've spent.

You don't always search for perfection,
The imperfections have a history of their own;
Only living those imperfect moments will reveal,
Parts of yourself, that you've never known.

Binary

Pratichi Roy
Class VIII (South Point High School)

Once a Stranger

You were once a stranger,
with messy hair tumbling down your forehead,
like wild waves that refused to be tamed.

You were once a stranger
with luminous lotus gaze,
you were once a stranger
with mahogany eyes.

You were once a stranger
with a towering figure,
you were once a stranger
with a vintage wristbound
looking every bit a gentleman.

You were once a stranger
with your sleeves rolled up
and collar undone.

You were once a stranger
who offered a friendly hand to me
on the first uncertain day of college.

You were once a stranger
with whom I first time became comfortable with—
who turned more than just a stranger,
who turned more than a friend.

Now after four years,
we chose to return where it began—
becoming strangers again..

A Chapter

You were the smile i never owned
the garden i forgot to water
the flower i never bent close enough to breathe

you were the book i left unopened
the car i never dared to dream

still
you became the secret
lodged between my ribs—
the one i never told anyone

in your eyes
time collapsed
and poetry leaned in
to whisper its private music

but when my hands trembled
you were not the shoulder
not the soul
i could lean on

they call it one-sided love
but i call it this:

i am a chapter, dog-eared and fading
you—
you are the entire story.

The Lost City of India- Musiris

Rakshit Chaurasia
VII C
Kendriya Vidyalaya Cossipore

In ancient time India was named as “golden bird” because it was a centre of trade and commerce profoundly. There are many cities and ports which were important trade centre. In a recent archaeological excavation at Pattanam near Kodungallur in Kerala, Roman coins, pottery and beads were found. Researchers are suggesting that it may have been part of an ancient city “Musiris”. Musiris was known for its trade with Roman empire, Egypt, Greece and Arab countries. Spices especially black pepper, gems, pearls, ivory and silk were exported from Musiris. But the main trade with Romans was black pepper because they used it in a high amount in their cuisine. At that time black pepper was regarded as Black gold. Initially Arab act as a middleman between Romans and India but later the demand met supply and the direct trade begin between them. India received gold, coral, glassware, olive oil and even Roman coins in payment of black pepper. Many such coins have excavated from pattanam which is claiming as the ancient lost city Musiris. We can find the traces of Musiris on ancient Roman maps. Old Tamil poems also provide us an idea about it. Musiris was a great port and an important Trade centre for some centuries. In the late 14th century BCE there may be some misery occurred such as flood, cyclone or any other disaster that put Musiris simply disappeared. Gradually it also disappeared from books and maps.

Painting : Rakshit Chaurasia

মূর্তি-ই হয় মা!

_জিতু দে

বাঁশের কাঠামো, খড়ের বাঁধনে,
মাটির প্রলেপ, দেবীর সাধনে।
ঢাকের তালে, ধূপের ঘ্রাণে,
জাগে শক্তি মায়ের টানে।
নিজের সৃষ্টি প্রতিমা বলে,
সাজিয়েছে কত শত
অথচ নিজের প্রতিমা কে—
ছিন্ন বসনে রাখে..!
যে মা তোমায় আদর করে,
ডেকে বসায় খেতে ঘরে,
সেই মায়ের কথা অবাধ্য হতে,
কেনই বা যাও ছুটে ছুটে?
আসলে মানুষ সৃষ্টি বোঝে,
স্রষ্টাকে সে চিনে না রে।
তাই, অবহেলিত আপন মা,
পূজিত হয় মাটির মা।
উনি আসেন পাঁচ দিনের তরে,
আলো, সাজে ঘর ভরে।

বাস্তব মা রয় সারাবছরে,
তবুও তার পরনে ছেঁড়া কাপড়ই জোটে!
মূর্তির রূপে মায়ের ছটা,
নিজের দশভুজার কাছে নেই কোনো কথা।
নিজের মা-ই গড়বে জীবন,
মাটির মাকে দিতে হবে বিসর্জন।
কেন তবে এত রঙ্গ, এত আলোর ছটা?
ঘরের মায়ের পূজা হোক,তাকেই বাটা দেওয়া হোক।
সম্মান হোক নিজের মায়ের
প্রতিমা, মায়ের প্রতিরূপ হোক।।

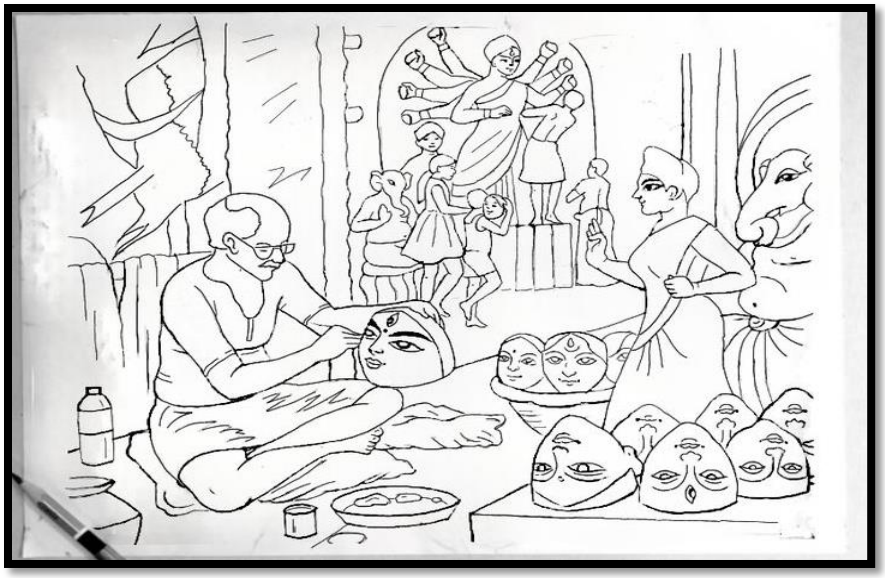

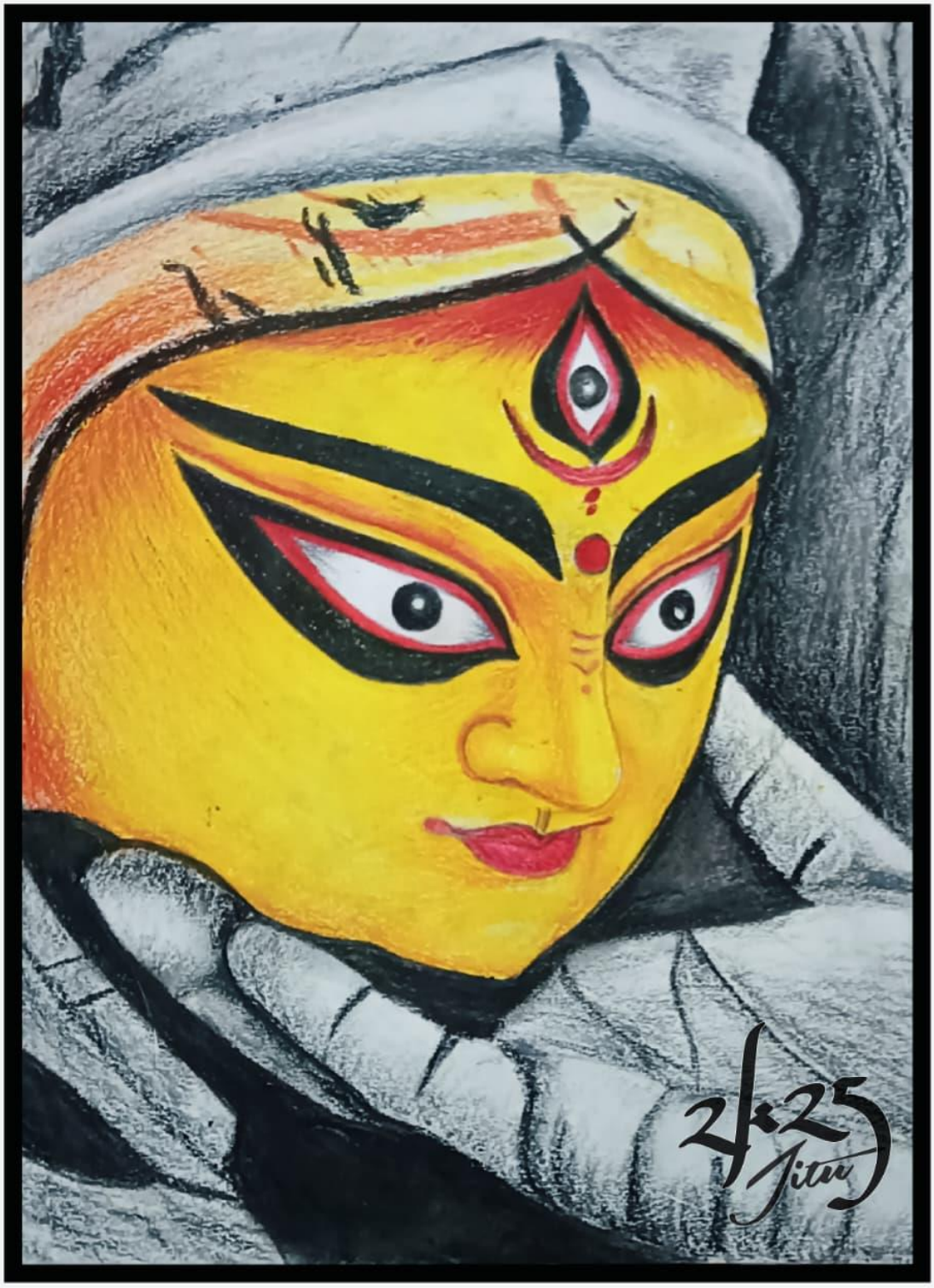

Painting : Jitu Dey